উপন্যাস সিরিজের একবিংশ সংখ্যা

নন্দন-পাহাড়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত
প্রণীত।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ.
"শিশির পাবলিশিং হাউস"
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবছুল গফুর,
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস
২৪২-১, অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

ওরে,

একদিন তোকে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখে ফুলে ফুলে ঘেরা বাড়ীটার ছাতের উপর দাঁড়িয়ে অদূরের "নন্দন-পাহাড়" দেখ্‌ছিলাম। সাঁঝের 'অরুণ' তখনও ডুবে যায়নি; তারি রঙিন আলোয় আলোয়, সবুজ ক্ষেতের মাঝে মাঝে ছড়ানো বাড়ীগুলি, মখমলের উপরকার চুণিপান্নার মতই শোভা পাচ্ছিল এবং বাইরের এই বিচিত্রতা বুকের মাঝখানটাকেও বিচিত্র করে তুল্‌ছিল! তার কারণ শুধু এই টুকুই যে, তুই আমার বুকের কাছে ছিলি; এবং তোর ভিতর দিয়েই স্পষ্ট আমার সব চাওয়ার শেষকে খুঁজে পেয়েছিলাম!

কিন্তু তখন তো মনে ভাবিনি, এম্‌নি করে তোকে সেই দেশেই রেখে আস্‌ব, যে দেশ থেকে নন্দন-পাহাড়ের পাষাণ স্তূপ নড়্‌বে না, আমার অন্তরের সকল আনন্দের উৎস, তুইও নড়্‌বিনে!

আজ বাঙ্‌লার এই কুড়ে ঘরের ছায়ায় আর আমার কোনো আনন্দই নেই; সব নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে!

"নন্দন-পাহাড়ের" আনন্দ তো বহন করে আন্‌তে পারিনি; শুধু পাষাণ স্তূপ বুকে করে টেনে নিয়ে এসেছি!

ওরে দুলাল, ওরে মাণিক,

তুই তোর কোমল কচি হাত দু'খানি দিয়ে এ পাষাণের স্তূপটা তুলে নিতে পারিস্‌?

সেনহাটী।
মনোমোহন পাঠাগার।
বৈশাখ, ১৩২৮।

নন্দন-পাহাড়

'এম্ এর' শেষদিনকার পরীক্ষার কাগজ দাখিল করিয়া যখন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন শরীরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। বাড়ীর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, চাকরটার হাতে কলম দুটা ফেলিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িলাম। মনে হইতেছিল, সমস্ত কলিকাতা সহরটা যেন আমাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। অপরিসর রাস্তাটা ছাড়াইয়া গাড়ী যখন গোলদীঘির ধারে আসিয়া পড়িল, তখন দু একজন পরিচিত সতীর্থের মুখ ও রাস্তার জনপ্রবাহ চোখে পড়িল; মনে হইল, যেন কতকগুলি ছায়া বাজীর পুতুল রাস্তার উপর দিয়া চলা ফেরা করিতেছে। একবার সোজা হইয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, তার পরেই চোখের সম্মুখে একটা অস্পষ্ট ধূসর যবনিকা নাচিয়া উঠিল। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, মনে হইল সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইতেছি। তখন গাড়ী পূর্ণ বেগে ছুটিতেছিল।

২

ভাদ্রের শেষ। বালিগঞ্জের একটা ছোট বাড়ীতে ঝুলবারান্দার উপর একখানা ঈজি চেয়ারে শুইয়া শুইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম।

বাড়ীর পশ্চিম দিকেই খানিকটা খোলা মাঠ। দূরে একটা ছোট লাল রংএর বাড়ীর আড়াল দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। পশ্চিমাকাশে খণ্ড, লঘু মেঘগুলি জমিয়াছে; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রংএর বিচিত্র পরিবর্ত্তন চলিতেছিল, রাঙ্গা মেঘগুলির শীর্ষে শীর্ষে সোণালি রং ঝলসেছিল; লাল রং ক্রমে গাঢ় হইয়া মেঘগুলির উপর ধীরে ধীরে কালিমা লেপন করিয়া দিতেছিল! সূর্য্য ডুবিয়া গেল, কিন্তু তখনও বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ চলিতেছিল। তার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যাসুন্দরী নীলাঞ্চল উড়াইয়া নামিয়া আসিলেন।

এতক্ষণ একদৃষ্টিতে রংএর খেলা দেখিয়া দেখিয়া একটা অবসাদ আসিতেছিল, ক্লান্তদৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেই দেখিলাম—একমুখ হাসি লইয়া বধূঠাকুরাণী আসিতেছেন!

—"বলি খাতা পেন্‌সিল এনে দিব কি? সূর্য্যাস্ত সম্বন্ধে কবিতা লিখ্‌বে? খুব লোক কিন্তু, দুবার এসে ফিরে গেছি, ধ্যান যে ভাঙ্গেই না!—তবু ত"—

বাধা দিয়া কহিলাম "সত্যি বৌদিদি! দুবার এসে ফিরে গেছ —তা ডাকনি কেন?"

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "ডাকিনি ভাব্‌লাম যে বোধ হয় একটু ভাল লাগ্‌ছে, এ তিন চার মাসের মধ্যে ত এমন করে ভাল থাকতে দেখিনি"—

—"সত্যি সূর্য্যাস্তটা ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল, বৌদি',—মনে হচ্ছিল, কত যুগ যুগান্তর থেকে এই বিচিত্র রংএর খেলা চলে আস্‌ছে"—

—"কবি মানুষ কিনা, তাই অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। সে আমি কতকটা অনুমান করেই নেব এখন, আমাকে বলতে যে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়বে! তার চেয়ে আমি যা' জানতে এসেছিলাম, সেই উত্তরটাই দাও; আর চা খাবে কি?"—

"তা বুঝেছি, কাজের মানুষ কিনা, তাই বাজে কথায় কান দেবার সময় নেই!—চা' চা'তো আর খাবনা কালই বলেছি, বৌদি!"

"তবে ওষুধটা এনে দি'? ওষুধ খাবারও তো সময় প্রায় হ'য়ে এল!"—

"ছাই ওষুধ,—ও গুলো খেয়ে আর কি হবে?"—

বৌদি গম্ভীর মুখে কহিলেন, "জানই ত ওটা বৃথা আপত্তি, ওষুধ খেতেই হবে, না খেলে,—"

"তোমার জ্বালায় দেশে টেঁকা যাবে না। এইত?—তা নিয়ে এস তোমার ওষুধ, যত ইচ্ছা খাওয়াও, আমি একটুও আপত্তি করব্ না।"—

বৌদিদির মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"তা আমার কি আর ইচ্ছে যে তুমি কেবলি ওষুধ খাও? কি করব, রোগ ছাড়ে না, তাই আমিও ওষুধ ছাড়ি না—"

বুঝিলাম একটু ব্যথা দিয়াছি, হাসিয়া কহিলাম, "আচ্ছা বৌদি, সত্যি ওষুধ না খেয়ে পারা যায় এমন কোনও ব্যবস্থা কি তোমার মাথায় আসে না? এত বুদ্ধি রাখ তুমি, আর আমার একটা উপায় কর্ত্তে পারবে না? আমি আর এমন করে রোগে

ভুগে পারি না; ইচ্ছা হয় নিজের হাতে এ দুঃসহ জীবনটাকে—"

বৌদিদি শিহরিয়া উঠিলেন, কাছে সরিয়া আসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন—"ছিঃ, পাগল হলে? এত লেখা পড়া শিখেছ কি ছাই? যা' মনে করাও পাপ, তাই তুমি মুখে আন্‌তে চাও?" বৌদিদির শেষ কথাগুলি আমার কাণে শাসনবাণীর মতই বাজিতে লাগিল।

অপ্রতিভ স্বরে কহিলাম, "রোগের জ্বালায় আমার মাথার ঠিক নাই! তুমি আমাকে ক্ষমা কর বৌদি!"

সেই স্নেহশালিনী নারীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

—স্বরটা একটু ধরিয়া আসিতেছিল, ধীরে ধীরে কহিলেন, "আজকার চিঠিতে একটা নূতন ব্যবস্থার কথা পেয়েছি।"

"চিঠি, কার চিঠি! দাদার?"—

বৌদিদির মুখে লজ্জা-কুণ্ঠিত হাসির একটু মৃদু আভাস ফুটিয়া উঠিল।—অঞ্চলের একটা খুঁট আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে কহিলেন,—"কোন ভাল একটা যায়গায় হাওয়া পরিবর্ত্তন কর্ত্তে গেলে বোধ হয় সুবিধা হতে পারে।"

আমি আগ্রহ ভরে কহিলাম, "সত্যি বৌদি, দাদা কি তাই লিখেছেন নাকি? না তুমি তাঁকে লিখেছ?"

"না আমি—হাঁ, আমি লিখেছিলাম একবার, খুব—মত হয়েছে, এখন তুমি স্বীকার হলেই ত সব ঠিক্ করে নেওয়া যায়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, "তা, পশ্চিমে গেলে আমি না খেয়ে মারা পড়্ব যে।"

বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বৌদিদি কহিলেন "সে কি ?"

"এই বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে হবে ত ? না—না আমি যাব না,—কিছুতেই না !" একটু নড়িয়া আবার স্থির হইয়া ঈজি চেয়ারটার উপর পড়িয়া রহিলাম।

"এখানে তোমার হাতের রান্না খেয়ে বেঁচে যাচ্ছি—আর সেখানে—না, আমি যাব না।"

বৌদিদি হাসিয়া উঠিলেন। "ওরে না ; পাগল, বৌদির হাতের রান্না ছেড়ে তোমার বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে হবে না।"

উৎসাহের আবেগে উঠিয়া বসিলাম।

"আঃ তা বল্তে হয় এতক্ষণ ! তা হলে তুমিও যাবে বৌদি ! ভিতরে ভিতরে এতটা পাকিয়ে তুলেছ ; কিন্তু আমাকে কিচ্ছুটি জান্তে দাওনি—বটে ? হাঁ যাব, আমি নিশ্চয়ই যাব ; পশ্চিমে কেন, তোমার হাতের রান্না খেতে তোমার সঙ্গে আমি যমের বাড়ীও যেতে রাজি আছি !"

বৌদিদির হাসি সেই বিরলান্ধকারের উপর দিয়া একটা আলোক তরঙ্গের মতই খেলিয়া গেল !

"বৌদি যখন যমের বাড়ী যাবে, তখন রাঁধুনির পদ খালি রেখে যাবে না ! শ্রীমানের জন্ম পাকা রাঁধুনি—শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে রেখেই যাবে।"

"সেটি হচ্ছে না, বৌদি,—ও পদটো তোমার একচেটে করে রাখতে হবে,—আর কারু রান্না ত আমার রুচ্‌বে না।"

"তা বুঝেছি। রান্না ঘরের ধোঁয়ায় বুঝি—ভাবী গিন্নির রং ময়লা হয়ে যাবে, তাই আমাকেই ও পদে পাকা করে রাখ্‌বে।"

হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলাম না; বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "ওষুধ নিয়ে আসি? না,—বাদ্‌লা হাওয়া দিচ্ছে ঘরেই চল।"

রোগশীর্ণ দেহটাকে কোনও মতে টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বিস্তৃত কোমল শয্যার উপর এলাইয়া দিলাম।

এম্. এ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াই যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে শয্যার সঙ্গে প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই করিয়া লইয়া ছিলাম। আজ প্রায় চারি মাসের মধ্যে গৃহত্যাগ করিবার শক্তি নাই; রোগের প্রথম আক্রমণে জীবনের একপ্রকার আশাই ছিল না, কিন্তু যমদূতগুলা যখনই দুয়ারে সমাগত হইয়াছে, তখনই বোধ হয় বৌদিদির সেবারতা মাতৃমূর্ত্তিখানি দেখিয়া দেখিয়া সরিয়া গিয়াছে। পক্ষপুটে আবৃত রাখিয়া বিহঙ্গিনী যেমন ব্যাধের কবল হইতে নিজ শাবককে রক্ষা করে, বৌদিদিও তেমনি করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

বৌদিদি ওষুধ লইয়া আসিলেন। ওষুধ খাইতেই একখানি ছোট প্লেট সম্মুখে ধরিলেন। কয়েকটা আঙ্গুর ও খানিকটা বেদানা ছিল। একটা আঙ্গুর তুলিয়া মুখে দিতে দিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম,—"বৌদি আমি যদি দেবর না হয়ে ছেলে হতাম, তাহ'লে কি এর চেয়ে বেশী যত্ন কর্‌তে পার্‌তে?"

চাহিয়া দেখিলাম, বৌ দিদির দুই চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মুখে একটু ম্লান হাসি, শরতের প্রভাতে শিশির সিক্ত তরুণ পল্লব শীর্ষে স্নিগ্ধ অরুণ লেখার মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সন্তানহীনা নারীর অন্তরে কোন্ এক গোপনতম স্নেহ-তন্ত্রীতে বোধ হয় একটু মৃদু আঘাত লাগিয়াছিল, তাই তাঁহার চক্ষে অশ্রু, মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম।

কাজের অছিলা করিয়া বৌদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৩

আশ্বিনমাসের প্রথমেই দেওঘর চলিয়া আসিলাম। নন্দন পাহাড়ের কাছেই একটা ভাল বাড়ী পাওয়া গেল, তাহাই ভাড়া লইলাম। বাড়ীটার দুইটী ভাগ;—দুইটী পরিবার এক বাড়ীতেই পৃথক পৃথক ভাবে বাস করিতে পারে। একটা অংশে পূর্ব্বেই ভাড়া হইয়া গিয়াছিল, কয়েকদিনের মধ্যে যাঁহারা ভাড়া নিয়াছেন তাঁহারা আসিয়া পৌঁছবেন।

আমরা অন্য অংশটি নিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া ফেলিয়া বিদেশে আমাদের ছোট খাট গৃহস্থালীটি ঠিক করিয়া লইলাম।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করিয়া লইয়া বৌদিদি আসিয়া কহিলেন, "এই আপেল কখানা আর দুধটুকু খেয়ে নেও ত. আমি পাক চাপিয়ে দিয়েছি, ঘণ্টাখানেকে সব ঠিক হয়ে যাবে, এতটা বেলা হয়ে গেছে, ভারী কষ্ট হচ্ছে—নয়?"

একটু হাসিয়া কহিলাম "না, কষ্ট কিছু হবে না; তবে আমি একটা কথা ভাবছি"—

"কি" ?

"ও ভাগটায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের হাল চাল, নাম গোত্র কিছুই ত জানিনে, বৌদি; ঠিক বনিয়ে থাকা শক্ত না হয়ে ওঠে! ঐ এক কারণেই এ বাড়ীতে আমার আস্‌বার ততটা ইচ্ছা ছিল না।"

বৌদিদি একটু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে কথা ত অনেকবার হয়ে গেছে! তা তুমি দেখ, আমি ঠিক বনিয়ে নেব; মানুষ ত, বাঘ ত আর নয়। বাঘও যে মানুষের বশ হয়।"

—"বাঘ বশ করা অনেক জায়গায় সহজ, কিন্তু মানুষ জীবটা মাঝে মাঝে এমনি দুর্বোধ্য হয়ে উঠে, যে, তাকে বশমানাতে অনেক ফলপ্রদ মন্ত্রও নিরর্থক হয়ে যায়"—

"ইঃ, আমি তা মানিনে! আর তারা যদি এমনি খারাপ লোক হয়, শুধু মাঝের দোরটায় একটা কুলুপ এঁটে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। আগে দেখাই যাক্ না, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়"—

এমন সময়ে পিসীমা ডাকিলেন, "বৌমা, একবার পাকঘরের দিকে যাও ত;" কাছে আসিয়া কহিলেন, "ওরে বিনু, এমন যায়গায়ই বাড়ী নিয়েছিস যে মানুষের মুখ দেখ্‌ব এমন যো-টি নেই—তারপর একটু বাবার মন্দিরে যাব, সেও ত কত দূরের পথ—একটু সহরের কাছে বাসা নিবি"—

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন,—"তা পিসীমা, আমাদের মুখ দেখ্‌লে চল্‌বে না? বাবার মন্দিরে যখন ইচ্ছা গেলেই হবে, পাল্‌কী করেও যাওয়া যায়; আর এ দেশে তো সব যায়গাতেই মেয়েরা হেঁটে যায়,—আমরা তাও ত পারব"—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বৌদিদি পাকঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পিসীমা হাতের মালা কপালে ঠেকাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আহা, প্রাতর্বাক্যে তোরা আমার চিরজীবী হয়ে থাক্, তোদের মুখ দেখ্‌লে দিন কাটবে না কেন? তবে কিনা বাবার মন্দিরে—"

পিসীমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলাম, "তা আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠি, তোমাকে আমি রোজ মন্দিরে নিয়ে যাব। হাঁটা চলা করলেইত এখানে শরীর ভাল হবে! এই পাহাড়ের কাছে খুব ভাল হাওয়া পাব বলেই কি এখানে বাড়ী নিয়েছি; এখানে বোধ হচ্ছে শীঘ্রই ভাল হয়ে যাব।"

—"তুই ভাল হয়ে ওঠ্, তুই যেদিন প্রথম মন্দিরে যেতে পারবি, সেই দিন আমি ভাল করে বাবার পূজো দেব—"

এমন সময়ে বৌদিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'পাক হয়ে গেছে, দুটি খেয়ে নেও।"

"—এরি মধ্যে পাক হয়ে গেল, বৌমা?" পিসীমা স্মিত মুখে বৌদিদির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

"—তা আর হবে না, বৌদি যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, পাকঘরে ঢুক্‌লেই পাক হয়ে যায়।"

"কথায় ভট্টাচার্য্যি! এখন ওঠ. বেলা ত কম হয়নি।" বৌদিদি পাকঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যার পর. খোলা বারান্দার উপর বসিয়াছিলাম, অল্প দূরেই নির্জ্জন নন্দন্ পাহাড়ের উপরকার ছোট মন্দিরটী ও অর্জ্জুন গাছটা নক্ষত্রালোকে দেখা যাইতেছিল। সহরের দিক্ হইতে দুই একটা কুকুরের ক্ষণ ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। পাশের বাড়ীটা একজন শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীর। বাড়ীটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের বাতাস ছুটাছুটি, মাতামাতি করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেই উদ্দাম বায়ুপ্রবাহকে সেবন করিবার জন্য ভিলার (Villa) নির্জ্জন বারান্দার উপর শুধু যে একজন রোগশীর্ণদেহ বাঙ্গালী ও তাহার বৃদ্ধা পিসীমাতা বসিয়া রহিয়াছে ইহা অনুভব করিয়াই যেন সেই বায়ু প্রবাহ অন্ধ রুদ্ধ আবেগে জানালার খোলা কবাট গুলির উপর মাথা খুঁড়িতেছিল, এবং ছাদের ফাঁক দিয়া প্রবেশ করিয়া কক্ষ মধ্যে আর্ত্ত পশুর মতই চীৎকার করিয়া ফিরিতেছিল।

পিসীমা হাতের মালাটা একবার কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন "হাওয়ার চোটে যে বারান্দায় বসাই দায় হ'য়ে উঠ্ল রে।"

আমি একটু হাসিয়া কহিলাম,—"তা' হাওয়া কেমন রেগে গেছে শুনছ? দরজা জানলাগুলি না ভেঙ্গে ছাড়বে না দেখ্‌ছি।"

"কে রেগেছে, ঠাকুরপো?"—হাস্য-প্রফুল্ল মুখে বৌদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শুনছ না? বাতাসের আর্ত্তনাদ, ঠিক্ যেন ভারি রেগে গেছে, এমনি চীৎকার করছে!"

"ষোল সালের সাইক্লোনের কথা বুঝি ভুলে গেলে? বাতাসের অমন শব্দ আমি কিন্তু জীবনে আর কখনও শুনিনি!"

"ঠিক্ বৌদি, জীবনে বিরাট যদি কিছু দেখে থাকি তবে সে ঐ একটা রাত্রিতেই দেখেছিলাম! প্রকৃতির অমন সংহার মূর্ত্তি যে কি করে আমাকে অতখানি আনন্দ দিল, তা আমি চিন্তা কল্লে স্তম্ভিত হয়ে যাই! মনে রাখবার মত একটা কিছু বুঝি সেই সর্ব্বপ্রথম দেখেছি, অনুভব করেছি! সৃষ্টিটা আমার কাছে সত্যি সেদিন বিরাট, বিপুল বলেই মনে হয়েছিল।"

"এই চালালে বুঝি তুমি তোমার পাঞ্জাব মেল,"—

আমি হঠাৎ বাধা পাইয়া আমার বিস্মিত দৃষ্টি বৌদিদির মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম,—"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আর কি,—এখন খেতে চল.তোমার কবিত্বের ফোয়ারা ছুট্‌লে ত নন্দনের হাওয়াকেও হার মানতে হবে।"

একটু অপ্রতিভ স্বরে কহিলাম,—"ও: এই কথা! কিন্তু সারা দিন এমন করে খাওয়ার তাড়া দিলেও তো বাপু অস্থির হয়ে উঠ্‌তে হয়।"

"খেয়ে দেয়ে আগে শরীরটা শুধ্‌রে নাও, তারপর যত পার কবিতালক্ষ্মীর অর্চ্চনা করবে।"

এমন সময়ে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। সমস্ত

দিনে যেখানে মানুষের পায়ের শব্দ শুনা যায় না, সেখানে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া আমরা সকলেই একটু উৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিলাম। দুই তিন মিনিটের মধ্যে গেটের কাছে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। একটা ছোক্‌রা গাড়ীর উপর হইতে নামিয়া কহিল, "বাবু, এই তালুকদার ভিলা আছে।"

বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমাদের অন্য সরিক বুঝি এলেন,—" আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

"এই মালী, মালী, গেট্‌ খুলে দাও,"—একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। আমি আমার চাকরটাকে আলো নিয়া গেট খুলিয়া দিতে বলিলাম। একটু পরেই চারি পাঁচ জন লোক বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। বৌদিদি ও পিসীমা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

"এই যে আপনারাই বুঝি অন্য ভাগটায় আছেন—নমস্কার।"

প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ,—আপনারা ?"

—"ব্রাহ্মণ"—

"আঃ বাঁচা গেল।—আমরাও ব্রাহ্মণ, মনে করেছিলাম, অন্য কোনও জাত হ'লে একটু মুস্কিল হ'বে—তা কি আর কর্ত্তুম, একরকমে চলেই যেত। যাক্, একটা বিষের ত চিন্তা দূর হ'ল।"

আমি আমার চাকরকে ঘরগুলি খুলিয়া দিতে বলিলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গে যাঁহারা একে একে গৃহ প্রবেশ করিলেন, এক এক করিয়া তাহাদের দেখিয়া লইলাম।

একটি বার তের বৎসরের ছেলে এবং চৌদ্দ পনের বৎসরের একটি মেয়ে একটি অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক, মনে হইল ঝি। বাহিরে গাড়ীর কাছে প্রৌঢ় ভদ্র লোকটি জিনিসপত্র নামাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলাম' তাঁহার সঙ্গে একটা চাকর ও ঠাকুর।

কয়েক মিনিট পরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বৌদিদি ভারি ব্যস্ত। মাঝের দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া নবাগতদিগের অংশে যাইতেছেন, আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি বৌদিদি ?"—

"ওদের ছেলেটি সমস্ত দিন গাড়ীতে কিছু খায়নি, এক বাটী গরম দুধ দিয়ে আস্‌লাম। ছেলেটিকে মেয়েটিকে এখন খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে আসি। ওঁদের জন্যও ভাত চাপিয়ে দিয়েছি, এ রাত্তিরে কি আর পাক করে খাওয়া পোষাবে ? বিদেশে হঠাৎ এসে উঠলে যদি পড়্শীরা সাহায্য না করে, তা'হলে প্রথম দিনটা ভারি কষ্টে যায়!"

"সেকি, এখনই এতটা করছ, একেবারে অপরিচিত যে!"—

"হলইবা অপরিচিত, কাল ত আর অপরিচিত থাক্‌বে না! তখন হয়তো মনে করবে, প্রথম দিনটা ওরা কি ব্যবহারটাই করলে!"

আমি বৌদিদির প্রকৃতি জানিতাম। সেবা করিবার সুবিধা পাইলেই এই মহীয়সী নারীটার আর আপন পর ভেদ থাকে না ?

একটু হাসিয়া বলিলাম, "তা'হলে আমি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করব ?"

—"তা'ত করবেই ! আমিও মেয়েটির কাছে বলেছি। আহ্নিকের যায়গা করে রাখছি, তুমি বলগে !"—

বাহিরে আসিলাম ; ভদ্রলোকটি একটা ষ্টীলট্রাঙ্কের উপর বসিয়া চাকরটাকে কি আদেশ করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে কাছে গিয়া বলিলাম, "আপনার আহ্নিকের যায়গা হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে নিন, এর মধ্যে পাক হয়ে যাবে। ভারি কষ্ট পেয়ে এসেছেন সমস্তটা পথ !"—

একটু বিস্মিতভাবেই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, "তা এর জন্ত আর আপনারা কষ্ট পাবেন না ; সব ঠিক করে নেব।" ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন,

"—সুজাতা ! অ' সুজাতা !"—

মেয়েটির নাম বুঝি সুজাতা,—মিষ্টি নামটি ! মৃদু হাসিয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে কহিলাম, "আমার বৌদি ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে গেছেন, তারা ছুটো খেয়েই এখনি আসবে।"

ভদ্রলোকটি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তোমরা বাপু অবস্থা যা করে তুলেছ, তা'তে তোমাদের হাতে একেবারে আত্ম সমর্পণ করা ছাড়া তো আর উপায় নাই দেখছি। ঐ যাঃ ! 'তুমি' বলে ফেললাম,—কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে, ছেলেদের সঙ্গে থাকতে থাকতে, 'তুমিটাই' আগেই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। "তা কিছু মনে"—বাধা দিয়া

তাড়াতাড়ি কহিলাম,—সে কি, "তুমিই বলবেন ;—আপনার ছেলেরা বয়সী হ'ব।"

কিছুক্ষণ ভদ্রলোকটি কোনও কথা কহিলেন না। তার পর গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"হাঁ, ছেলের বয়সীই হবে, তোমার বয়স একুশ বাইশ হবে মনে হচ্ছে। প্রভাত যখন চলে গেল, তখন তার বয়সও উনিশ বছর হয়েছিল। তার বি, এ, পাশের খবর যেদিন বেরুল, ঠিক সেদিনই সে চলে গেল—"

আমি প্রায় চীৎকার করিয়া কহিলাম, "প্রভাত? প্রভাত চাটুয্যে, আপনার ছেলে? আপনি"—

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তাকে তুমি কেমন করে চিনলে?"—

"রিপনে তার সঙ্গে পড়েছি যে,"—তিনি আর কোনও কথা বলিলেন না। নন্দন পাহাড়ের অপর দিকে যেখানে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছিল, সেই দিকেই স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে বৌদিদির প্রেরিত চাকরটা আসিয়া খবর দিল, "আহ্নিকের জায়গা হয়েছে।" কোঁচার খুঁটটা তুলিয়া একবার চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া গাঢ়স্বরে তিনি কহিলেন, "চল বাবা; মা লক্ষ্মী—আজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে এ বুড়ো ছেলেটিকে একেবারে আপনার ক'রে নিলেন।"

প্রভাতের পিতা বিমলপ্রসন্ন বাবুকে ইহার পূর্ব্বে আর কোনও দিন দেখি নাই। তিনি মফঃস্বলের একটা বড় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন জানিতাম। আজ নন্দন পাহাড়ের নীচে

বাড়ীটার বারান্দার উপর, যেখানে আশে পাশে রাশি রাশি অন্ধকার বুকের ভিতরের দুঃখরাশির মতই জমাট বাঁধিতেছিল, ঠিক সেইখানেই এমনই ভাবে প্রিয় সতীর্থের শোকাতুর পিতাকে দেখিব, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও একবারটিও তাহা মনে করিতে পারি নাই।

(৪)

অগ্রহায়ণের শেষ। আমার হৃতস্বাস্থ্য দ্বিগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়া বিধাতা পুরুষটী তাঁহার বুদ্ধি ও বিবেচনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলেন, যে, আমার ক্ষতিপূরণ সকল দিক্ দিয়াই করিবেন!

সে দিন ভোর বেলাটাতে দারুণ শীতে হাত পা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। তবু সকালের হাওয়া খাওয়ার লোভটা ছাড়া অসম্ভব মনে হইল। গরম কাপড় চোপড় পরিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে বৌদিদি দুয়ার খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"ঠাকুরপো বুঝি এই ভোরেই বেরুচ্ছ? আজ কোন্ দিক্ জয় কর্ত্তে যাবে তা'হলে?—

—"কেন আমায় কি 'দিগ্বিজয়' পেলে নাকি?"—

—"দিগ্বিজয়!—দিগ্বিজয়ের যে টুকু বুদ্ধি ছিল, তার অর্দ্ধেকটুকুও যদি তোমার থাকৃত, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্ত্তে পার্ত্তাম্!"—

হঠাৎ আজ আমার বুদ্ধি বিবেচনার অস্তিত্ব বিষয়ে বৌদিদির এতখানি সন্দেহ দেখিয়া মনের ভিতরটায় একটু অস্বস্তি অনুভব

করিলাম। বুঝিলাম একটা কিছু মতলব আছে, তাই এই অপবাদ দেওয়া! একটু গম্ভীরভাবে পরিহিত বেশভূষার দিকে তাকাইলাম। দিগ্বিজয়ের চেয়েও বুঝি কম!—বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না!

গলার স্বর খাটো করিয়া কহিলাম,—"নাঃ, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না! বিশ্ববিদ্যালয় যে জয়-পত্রিকাগুলি ললাটে বেঁধে দিয়েছে, তা'তে বুদ্ধি কম এমন কথা তো লিখে নাই, বৌদিদি!—ও! তোমার কিছু মতলব আছে, ঠাক্‌রুণ!—

—"মতলব কিছু নেই আমার,—তবে আজ থেকে তোমার চা খেতেই হবে, এই বলে যাচ্ছি,—আমি জল চড়িয়ে এসেছি; চা খেয়ে বের্ হ'য়োনা কিন্তু"—

সে হচ্ছে না বৌদি, যা ছেড়েছি তা আর কেন?

না না, সে হবে না, চা তোমাকে খেতেই হবে।"—

বৌদিদি মৃদু হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল; সরিয়া আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলাম;—

—"সে হচ্ছে না বৌদি, চা যদি আমাকে খেতেই হয়, কেন খাব, সেটাও আমাকে জান্‌তেই হবে"—

"তা' আমি বল্‌ব না; তবে তোমাকে যে চা খেতেই হবে এটা কিন্তু অত্যন্ত ঠিক।"—

একেবারেই নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য বলিলাম—"বাঃ, আমাকে যে একবারে কোলের ছেলেটি পেয়ে বস্‌লে,—খা, তোর ওষুধ খেতেই হবে;

সময়ে অসময়ে খাবার খেতেই হবে;—মধ্যে মধ্যে কাঁচা মাথাটাও খেতে হবে; তার উপর আবার চা!"—হাতের আস্তিনটা গুটাইয়া, সবলপুষ্ট ডান হাতটা একটু মেলিয়া ধরিয়া কহিলাম,—"এঃ, আমি কি আর সেই রোগা, প্যান্‌পেনে বিন্নু মুখুয্যে আছি নাকি? আমি সেল্‌ফ্‌ গবর্ণমেন্ট (Self-Government) চাই, স্বরাজ চাই,—নইলে বিদ্রোহ করব,—একেবারে আইরিশ্‌ সিন্‌ফিন্‌দের মত!'

বৌদিদির মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল। "ভারি ত বীরপুরুষ, ধাক্কার বায়ে মক্কা যান্‌! আচ্ছা, তুমি বিদ্রোহ কর, আমিও 'মেশিন্‌ গন্‌' (Machine Gun) তৈয়ারী করে তুল্‌চি,"—

ভারি দমিয়া গেলাম! এই মেশিন্‌ গন্‌টা" যে কি পদার্থ তাহা জানিতাম না;—তবে বৌদিদি প্রায়ই ভয় দেখাইতেন, আর সে ভীতিটা একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতই আমার মনের মধ্যে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল।

"তোমার এ বিদ্রোহের ব্যাধিটা যে সংক্রামক হ'য়ে উঠ্‌তে চল্‌ল;—না, চা তোমাকে খেতেই হবে;—বসে থাক ওই চেয়ার-টার উপর,—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা' নিয়ে ফিরে আস্‌ব!"—

দ্রুতহস্তে জানেলার কবাটগুলি সব খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া টেবিলটা ঝাড়িয়া, গুছাইয়া, বৌদিদি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি সুশীল ও সুবোধ বালকটির মতই টেবিলটার একটা পাশ চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। বিদ্রোহটা যেমন করিয়া যে

'সংক্রামক' হইয়া উঠিল, ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছিলাম না, অথচ ঐ কথাটার মধ্যে যে অনেকখানি লুক্কায়িত অর্থ রহিয়াছে তাহাও বেশ বুঝিতেছিলাম। কিন্তু "মনের অগোচর ত পাপ নাই!" কিছু বুঝিলাম না; কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা গোপন-তন্ত্রীতে অতি মৃদু একটা পুলক ঝঙ্কার রহিয়া রহিয়া সাড়া দিতেছিল, তাহা অস্বীকার করাও চলিতেছিল না; নিজের বুকের উপর কাণ পাতিয়া সেই সাড়াটা কোনও দিনই শুনিতে সাহস করি নাই; কিন্তু সে যে ক্রমেই সুরের পর্দ্দা চড়াইয়া দিতেছিল, এবং অন্যের কাছেও ধরা পড়িবার মত অবস্থা করিয়া তুলিতেছিল, সে তথ্যটাও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

এমন সময়ে বৌদিদি ঘরের মধ্যে আসিয়া টেবিলের পাশেই চায়ের পেয়ালাটা ও একখানা প্লেটে কিছু খাবার রাখিয়া দিলেন এবং কহিলেন,—"কাল রাত্রে কিছু খেতে পায় নাই, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে এখন"—

—"হাঁ বৌদিদি, তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে —কিন্তু এতক্ষণ সেটা টের পাইনি তো,—"

"বেশ, চা'টা আর ঐ খাবার কিছু খেয়ে হাওয়া খেতে যাও!"—

নিরুপায় হইয়া কহিলাম, "চা আর ঐ খাবারগুলি খেয়ে আবার হাওয়া খেতে যাব—পেটে সইবে ত?"

"দেওঘরের জল ভাল, খুব হজম করায়, জল একটু বেশী ক'রে খেলেই আর কোনও আপদ্ থাকবে না।—"

"এ গুলি হজম কর্‌বার জন্য আবার বেশী করে জল খেতে হবে,"—একটু এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলাম "বৌদি", আমি বল্‌ছি যে,"—

"হাঁ, কি তুমি বল্‌ছ ?"—

"তুমি যদি এখন মার্শ্যাল ল' জারি করে বস, তা' হলে"—

—"আর তোমার কিছুই বল্‌বার থাকে না,—এইতো, কেমন ?"—

স্বর যথাসম্ভব মোটা করিয়া বলিলাম,—

"হাঁ !—"

"ঠিক্ তাই, 'মার্শ্যাল ল' জারি কর্‌লে খুব দ্রুত ফল দেখা যায় ;—চা' জুড়িয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও—"

"এই ত খাচ্ছি"—স্বরটা নিতান্ত মিহি রকমের বাহির হইয়া গেল,—নিজের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ! ওটা 'মার্শ্যাল ল'র গুণ বোধ হয় !—

চা শেষ করিয়া খাবারগুলি উদরস্থ করিলাম !

বৌদিদি একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—

"লক্ষ্মী ছেলে,—এই তো চাই !"

—"ভারি লয়্যাল্ !—নয় ?"—

স্বরটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছিল। সেটা চা ও খাবারের গুণে, কি বৌদিদির প্রশংসা-বাণী শুনিয়া, ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না !

চায়ের পেয়ালা ও প্লেট সরাইয়া নিতে নিতে বৌদিদি

কহিলেন,—"আচ্ছা, এখন বেড়াতে যাও। বেশী রোদ্ উঠ্‌বার আগেই ফিরে এস কিন্তু!—

বৌদিদি চলিয়া গেলেন। সদর্পে মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। লাঠি গাছটী দেওঘরেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারান্দার উপর আসিতেই পিছনে চাবির শব্দ পাইয়া ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, বৌদিদি ডাকিতেছেন। ফিরিয়া আসিলাম। বৌদিদি তাঁহার নিজের ঘরটার মধ্যে চলিয়া গেলেন। দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিলাম, "বৌদিদি, ডাক্‌লে?"—

ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বৌদিদির ছোট টেবিলের কাছে সুজাতা মাথাটী অসম্ভব রকম নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

চূর্ণ কুন্তল কপোলের পাশে পাশে উড়িতেছিল, খোলা জানালার ফাঁক দিয়া প্রভাতারুণের কোমল রশ্মি তাহার মুখের একটা পাশে পড়িয়াছে এবং সেই দিক্‌কার কর্ণভূষা মৃদু আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

টেবিলের উপর একটা চায়ের পিয়ালা, সুজাতা তাহা স্পর্শ করে নাই, এবং অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, চা'টা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বৌদিদির মুখের দিকে চাহিলাম, ঐ লাঞ্ছিতা বালিকার কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহার মুখে একটু দুষ্ট, হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে হাসির অর্থ অনেকখানি গভীর! ঠিক বৌদিদির ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তা... ...হ-

আমার ছিল না। তবে বিদ্রোহ যে কোথায় সংক্রামক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আমার তিলমাত্রও বিলম্ব হইল না। এবং বৌদিদির কঠোর 'ম্যার্শ্যাল ল' যে এখানে ফেল পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া ভারি খুসি হইয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে আমার অন্তরের সেই গোপন তন্ত্রীটার সুরটা আর একটু উঁচু পর্দায় সাড়া দিয়া উঠিল, এবং সেই দারুণ শীতের মধ্যেও আমার কাণের কাছটা অসম্ভব রকম গরম হইয়া উঠিল; বোধ হয় লালও হইয়াছিল।

কোন্ সময়ে যে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম, স্মরণ নাই। একটু গোলমালে চমক্ ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিলাম, ঠিক্ ডাক ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। চিঠি পত্রগুলি আনিবার জন্য ডাক ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

৫

পরদিন ভোর বেলাটায় পিসিমা আসিয়া ডাকিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "আজ পূর্ণিমা, বাবার মন্দিরে নিয়ে যাবি নে?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিলাম, "তা' তুমি যেতে চাও, চল, কিন্তু আজ এই পরবের দিনে ভারি ভিড় হবে যে। মন্দিরে ঢুক্‌তে প্রাণান্ত হয়ে যাবে, সে দিন তো জানই, পরব ছিল না, তবু কি কষ্টটাই পেলে"—

পিসিমা একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল! ঠাকুরের দেখা কি অম্‌নিই পাওয়া যায় রে? ওটুকু কষ্ট কি কষ্ট রে? সে কালে পায়ে হেঁটে দু' পাঁচ শ' ক্রোশ পথ

চলে, তবে না লোকে তীর্থ ধর্ম্ম কর্‌ত! তা'দের ফলও হত;—আর এখন রেল ষ্টীমার হ'য়ে ঘরের দোরে সব তীর্থ এগিয়ে এসেছে, তবুও আমরা অভাগীরা তীর্থধর্ম্ম করা ছেড়ে দিয়েছি! ঠাকুর যদি অদৃষ্টে না লেখেন, তবে তাঁর দেখা পাওয়া যায় কি? মহাপাপী আমরা জন্মে জন্মে কত পাপই করেছি, তাই—"

পিসিমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিলাম, "তা' ঠিক্‌ই তো পিসিমা, একটু কষ্ট কর্ত্তে হয় বই কি? তা আমি গাড়ী করে আসি' তুমি ঠিক্ হয়ে নাও।"

"না, তোর আর গাড়ী কর্ত্তে হবে না, কতটা দূরই বা আর হবে, আমি পায়ে হেঁটেই যাব,"—

"সে কি হয় পিসিমা, আজ ভারি ভিড় হবে যে?"—

"হ'ক্ না ভিড়; তুই-ই তো সে দিন বল্‌ছিলি যে কোথাকার রাজা নাকি গঙ্গাজলের ঘড়া মাথায় করে' কত পথ হেঁটে বাবার মন্দিরে এসে থাকেন,—আর এম্‌নি পাপিষ্ঠি আমি, এখান থেকে ওখানে গাড়ী করে যাব? না, তা' হবে না,—তুই হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে, তার পর চল্‌,"—

এমন সময় বৌদিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন,—

"হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে বাবার মন্দিরে যাওয়া,—পিসিমার যে কথা!—না, সে সব হবে না; তুমি ফিরে এসেই খাবে, ঠাকুরপো!"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলাম, "সেকি, আমি অসুখের মানুষ, অতবেলা না খেয়ে থাক্‌তে পা্‌র্‌ব কেন?"

"হ্যাঁ অসুখের মানুষ! আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি বুঝ্‌ব।—বাবার মন্দিরে একটু সংযত হয়েই যেতে হয়, ওখানে আর তোমার ইংরিজি মত চালিয়ে কাজ নেই, ভাই,"—শেষ কয়টী কথা বৌদিদি ভারি গম্ভীরভাবে কহিলেন। তাঁহার চোখে মুখে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার কোমলশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"তা' অন্নদাত্রী যখন তুমিই বৌদি', তখন ওর আর কোনও তর্কই চল্‌তে পারে না"।

"বেশ, তা' হ'লে ঠিক্ হয়ে নেও, আমি সঙ্গে যাব;—আর একটী প্রাণীও যাবে কিন্তু, বুঝ্‌লে?"

এই "আর একটী প্রাণী" যে কে, তাহা তাহার বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। বৌদিদির মনে কি কল্পনা ছিল তাহা তিনি কোনও দিনই ভাঙ্গাইয়া বলেন নাই। তবে ইদানিং 'সুজাতার' নাম আমার সম্মুখে বড় একটা উচ্চারণ করিতেন না। কিন্তু এমনি স্নেহ প্রীতি-বিজড়িত ইঙ্গিতে আভাসে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, যাহাতে আমার বুকের ভিতরকার শোণিতোচ্ছ্বাসটা সময়ে সময়ে বড়ই দ্রুত তালে নাচিয়া উঠিত!

বৌদিদি চলিয়া গেলেন। একটু পরেই পিসিমা বাহিরে আসিয়া রীতিমত ডাকাডাকি সুরু করিয়া বেলা যে খুব অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে সকলকেই তাহা জানাইয়া দিলেন। বৌদিদি বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার পশ্চাতে সুজাতা। আমি ফটকের কাছে ঐ দুই সদ্যঃস্নাতা ক্ষৌমবাস-পরিহিতা নারীকে দেখিলাম। বৌদিদির মুখে জগজ্জননীর মুখচ্ছবির ছায়া অত্যন্ত

সুস্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর তাঁহার পিছনের লজ্জা-বিনম্রমুখী কিশোরীটীর মুখশ্রীর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা বিশ্লেষণ করিতে আমি কোনও দিনই সাহস করিতাম না।

গেটের বাহিরে আসিতেই দেখিলাম, বিমলপ্রসন্নবাবু ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছেন। প্রসন্নদৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কি বাবা, কোথায় বেরুবে ?"

"মন্দিরে যাওয়ার জন্য পিসিমা ভারি ধরেছেন,—তাই বেরিয়েছি !"

"মা লক্ষ্মীও যাচ্ছেন বুঝি ? ওকি সুজাতাও যাচ্ছিস্ ? তা' বেশ্ বেশ্।—ভারি ভিড় হবে আজ, তুমি একলাটী যাচ্ছ বিনু, অজিতকে সঙ্গে নিয়ে যাও না কেন ? সে চল্‌তে ফির্‌তে ভারি শক্ত হয়ে উঠেছে ; বিশেষ মা লক্ষ্মীর সঙ্গে এই কটা মাস দেওঘরে থেকে তার অনেক রকম শিক্ষাই হয়েছে। ও অজিত, অজিত !"

অজিত নন্দন-পাহাড়ের দিকে যাইতেছিল, পিতার আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"ও অজিত, তোর দাদাবাবুর সঙ্গে যা'না রে মন্দিরে।"

অজিত ভারি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইয়াই দেখিল, রীতিমত একটা পল্‌টন্ মন্দিরোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে।

বোতাম খোলা জামাটার ভিতর দিয়া অজিতের পুষ্ট গৌর দেহটার খানিকটা দেখা যাইতেছিল। সে দুই হাতে বোতাম টানিয়া দিতে দিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল।

—"মন্দিরে যেতে পার্‌বি তোর দাদাবাবুর সঙ্গে—"বিমল-প্রসন্ন বাবুর মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অজিত বলিয়া উঠিল, "খুব পার্‌ব, বাবা!"—এবং দ্বিতীয়বার বলিবার অপেক্ষা না করিয়া অজিত আমাদের এই ক্ষুদ্র পল্‌টন্‌টীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইল।

মন্দির-প্রাঙ্গণে যখন প্রবেশ করিলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। বিস্তৃত মন্দির-প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ; কোনও মতে একপার্শ্বে একটু স্থান করিয়া লইলাম। খাতা বগলে পাণ্ডার দল আমা-দিগকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমরা যে ধরনীধর পাণ্ডা ঠাকুরের আশ্রিত জীব এই সংবাদটী প্রদান করিয়া সকলকেই পরম আপ্যায়িত করিয়া দিলাম। পাণ্ডাঠাকুরের দলও একে একে শিকারান্তর অন্বেষণে সরিয়া পড়িল।

মন্দির-প্রাঙ্গণের বিপুল জনসংঘ সমুদ্রতরঙ্গবৎ সংক্ষুব্ধ হইতে-ছিল; মিশ্রিত জন-কোলাহল একটা বিরাট গর্জ্জনের মতই শুনা যাইতেছিল! কোথায়ও এতটুকুও স্থান নাই। সকলেই কর্ম্ম-ব্যস্ত; আসিতেছে, যাইতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে!

পুষ্পবিল্বদলের মিশ্রগন্ধে বায়ুপ্রবাহ নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। ভিক্ষার্থীর যাজ্ঞাবাণীর সঙ্গে ঢোলমাদলের বাজনা ও সানাই বাঁশীর সুর মিশিয়া এক অপূর্ব্ব কলতান সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে! বিস্ময়স্নিগ্ধ বালক-বালিকার অস্ফুট কলরোলের সহিত লজ্জাকুণ্ঠিতা নারীর শঙ্কাচকিত দৃষ্টি মিশিয়াছে। পুরুষকণ্ঠের কোলাহলের মধ্যে বর্ষীয়সী রমণীর ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে!

কেহ ষোড়শোপচারে সাজাইয়া অনাদিদেবের পূজোপকরণ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; কেহ উপহারসম্ভার স্তূপীকৃত করিয়াছে; কেহ মন্দির চত্বরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে, দেবাদিদেবের পাদমূলে নিবেদন করিয়া দিবার মত কত বেদনাই হয়তো সে বহন করিয়া আনিয়াছে।

কেহ রঙ্গিন্ শালু, বা রেশমসূত্র টানাইয়া বাবার মন্দির চূড়ার সহিত মায়ের মন্দির চূড়া সংযুক্ত করিয়া দিতেছে। দেবতা তাহার কোন্ কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, তাই সে তাহার ভক্তি-উপহার লইয়া আসিয়াছে!

আবার কেহ দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িতেছিল; দেবতা তাহার কামনা পূর্ণ করেন নাই;—তবু সে দেবাদিদেব শঙ্করের পাদমূলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দেবতা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছেন; স্বর্ণপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, নির্ম্মম ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন; জীবনের আশা, আনন্দ, আলো নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, নিভিয়া গিয়াছে! আঁধার ঘরের মাণিক, সাতরাজার ধন এক মাণিক কোথায় পড়িয়া গেল, কে হরণ করিয়া লইল? কোথায় শান্তি? কেমন করিয়া তীব্র চিত্তদহনের অবসান হয়?—শান্তি হয়?

ভাগ্যহীন আসিয়াছে তোমার দুয়ারে;—হে শঙ্কর! হে দেবাদিদেব! শান্তি দাও—ঐ ভাগ্যহীনকে!

অল্পকালমধ্যেই আমাদের পাণ্ডাঠাকুর দেখা দিলেন। ধরণীধর ঠাকুরের ক্ষীণ দেহখানা যে অতটা ভরসা বহন করিয়া আনিতে

পারিবে, তাহা পূর্ব্বে মনে করি নাই। আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেও বোধ হয় মানুষ অতটা খুসি হয় না, যতটা খুসি হইয়াছিলাম আমরা ঐ দীর্ঘদেহ সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্মণটীকে পাইয়া।

মন্দিরে প্রবেশের সমস্ত আয়োজন পাণ্ডাঠাকুর অতিক্ষিপ্রতার সহিত শেষ করিয়া ফেলিলেন।

পাষাণ প্রাচীরের গাত্রে ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার; সেই দ্বার সম্মুখে শত শত বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়সী, উন্মুখ আগ্রহে মন্দির প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ক্ষুদ্র দ্বার মুহূর্ত্তের জন্য উন্মুক্ত হইতেই সকলেই প্রাণপণ আগ্রহে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতেছে। যে সবল, সে দুর্ব্বলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে; যে অর্থশালী সে দ্বাররক্ষীকে অর্থপ্রদান করিয়া নিজের প্রবেশের সুবিধা করিয়া লইতেছে। সব দিকেই ভারি বিশ্রী রকমের উলট্ পালট্, বিশৃঙ্খলা, সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিতেছে। কাহারও কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য জ্বলিতেছে, পায়ের নীচে পাষাণখণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাত্রীদলের অবস্থা এমনই হইয়া উঠিয়াছে, যে তাহা কল্পনা করাও দুরূহ!

ধরণীধর ঠাকুর দ্বাররক্ষী পাণ্ডার সহিত কি বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। সহজে প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইব মনে করিয়া অতি কষ্টে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রথমেই আমি কোনও মতে পথ তৈয়ারী করিয়া লইতেছিলাম; আমার

পশ্চাতেই সুজাতা তারপর বৌদিদি ও পিসিমা, সর্ব্বশেষে অজিত।

দ্বারের কাছে আসিতেই দ্বার খুলিয়া গেল; দুই পাশ দিয়া উন্মত্ত জনসংঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাহারা সম্মুখে ছিল তাহাদের পিষিয়া, দলিয়া, পশ্চাতের যাত্রীর দল অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাশের একটা লোক পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা পাইয়া একেবারে সুজাতার উপর আসিয়া পড়িল। বামহস্তে সুজাতাকে ধরিয়া ফেলিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার প্রচণ্ড ঘুষি লোকটার মাথার পাশে নামিয়া আসিল। তাহার আর্ত্তচীৎকার যাত্রীদলের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া গেল। আমার উপর চাপিয়া পড়িয়া কতকগুলি লোক মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া একবার বৌদিদি ও পিসিমার দিকে চাহিলাম। অজিত একপা পিছনে হটিয়া গেল। তিন চারিজন তাহার স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৌদিদি ও পিসিমাকে রক্ষা করিবার জন্য সম্মুখের দিকে ফিরিতে গেলাম। সুজাতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, তাহার মুখখানা একেবারেই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে তাহা দেখিয়াই বুঝিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে আর একটা তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিল এবং মন্দিরের মধ্যে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সুজাতার বাহুমূল দৃঢ় হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন ফিরিয়া চাহিলাম, তখন মনে হইল একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি।

হাত বাড়াইয়া পাষাণ প্রাচীর পাইলাম, এবং সুজাতাকে

টানিয়া প্রাচীরের দিকে সরিয়া গিয়া আশ্রয় লইলাম। মন্দিরের দুয়ার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুজাতার অবসন্ন দেহ আমার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"এই প্রাচীরে পিট্ রেখে একবার ঠিক্ হয়ে দাঁড়াও তো সুজাতা!—বৌদি, পিসিমা বাইরে পড়ে রইলেন যে!—আমি দোরটা খুলে তাদের রক্ষে কর্ত্তে পারি কিনা দেখি!"

কোনও উত্তর পাইলাম না। সুজাতার বাহুমূল ধরিয়া সবলে নাড়া দিলাম। সুজাতা বিন্দুমাত্রও সাড়া দিল না।

এতক্ষণ আমার বাহুর উপর আশ্রয় পাইয়াছিল, এখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইবার মত হইল। অবস্থা বুঝিয়া দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিলাম। তাহার মূর্চ্ছাতুর দেহলতা আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল।

"সুজাতা, ও সুজাতা, এ বিপদের সময় তুমি এমন হয়ে পড়্লে?"—আমি প্রায় উন্মাদের মতই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম।

আমার তখনকার মানসিক উদ্বেগ বর্ণনাতীত। বাহিরে বৌদিদির ও পিসিমার কতই লাঞ্ছনা হইতেছে, মনে করিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছিল পাষাণ প্রাচীরের উপরেই মাথা খুঁড়িয়া মরি।

মন্দিরের ভিতরকার সেই রুদ্ধ দরদালানের দারুণ অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য যাত্রীর দল যেন প্রেতের মতই বিচরণ করিতেছিল।

দলিত পুষ্পবিল্বদলের, দধি দুগ্ধ ঘৃতের, নানা পূজোপকরণের মিশ্রগন্ধে মন্দির বায়ু সত্যই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। মন্দির তল

পিচ্ছল, কর্দ্দমাক্ত; অসংখ্য যাত্রী দেবতার দর্শন পাইবার জন্ম মন্দির মধ্যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিতেছে; সেখানে ঘৃতের প্রদীপটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া অন্ধকার দূর করিবার জন্ম বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ত্রস্ত মন্ত্রোচ্চারণ, নিষ্পিষ্ট যাত্রীর অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি,—পাণ্ডাদিগের কলরব,—সবটা মিলিয়া মিশিয়া একটা বীভৎস ব্যাপার গড়িয়া তুলিয়াছে।

একবার মনে হইতেছিল এই বিপুল কোলাহল কলরবের মধ্যে, অর্থগ্রহণের এই লুব্ধ আয়োজনের মধ্যে, পাষাণ প্রাচীর বেষ্টিত অন্ধকারের মধ্যে কোথায় দেবতার স্থান?

কিন্তু তখনই আবার দর্শনপ্রার্থী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভক্তি ও নিষ্ঠার, আগ্রহ ও ব্যাকুলতার ছবি চোখের কাছে ফুটিয়া উঠিল!

মনে হইল, এই পাষাণ প্রাচীরের অন্ধকারের মধ্যে দেবতা তিষ্ঠিতে না পারিয়া বোধ হয় ঐ যাত্রীদলের শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ের মধ্যেই স্থান করিয়া লইয়াছেন!

অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া আসিল, সুজাতার মুখের দিকে চাহিলাম; চক্ষু দুইটী অর্দ্ধ মুদ্রিত, বিশৃঙ্খল চুলের রাশি, চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে!

আমার পাশেই কাহারা দণ্ডায়মান ছিল। মৃদু অস্ফুটস্বরে কেহ কহিল, জিজ্ঞাসা কর না ওঁকে, মেয়েটীর কি হয়েছে!"

চাহিয়া দেখিলাম, একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা যুবতী তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী যুবককে কথা কয়টী বলিলেন! যুবক আমার দিকে ফিরিতেই

বলিয়া উঠিলাম, "আমার সঙ্গের এই মেয়েটী অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে, আপনি দয়া করে একটু সাহায্য করবেন ?"—

—"দয়া' এর মাঝে কিছু নেই, বলুন, কি সাহায্য আপনাকে কর্ত্তে পারি"—

"একটু জল কি এখানে মিলবে ?"

—"জল ?—না, দোর না খোলা পর্য্যন্ত জল পাওয়া যাবে মনে হয় না ; আমার সঙ্গে একটা ভাঁড়ে কিছু চরণামৃত রয়েছে, তারি দু' একটা ঝাপ্‌টা দিয়ে দেখ্‌তে পারেন।"—

দুই তিনটা ঝাপ্‌টা দেওয়ার পর সুজাতা একবার চমকিয়া উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিল। মুখের কাছে নীচু হইয়া ডাকিলাম,—"সুজাতা !"—

সুজাতা মাথা নাড়িল ; তার পর চারিদিকে চাহিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

যুবকটী কহিলেন, "ওঁর জ্ঞান ফিরেছে ; স্থির হতে কিছু সময় নেবেন। আপনি এক কাজ করুন, ওঁকে আমার স্ত্রীর কোলে শুইয়ে দিন্ ; তার পর আসুন, আমারা দোরটা খোলাবার চেষ্টা করি।—এ ভাবে এর মধ্যে আর কিছুক্ষণ থাক্‌লে মারা পড়্‌বেন যে !"—

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা যুবতীটী প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার কোলের উপর সুজাতাকে শোয়াইয়া দিয়া মন্দিরের দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিলাম। একটা পাণ্ডাঠাকুরকে কিছু দক্ষিণা কবুল করিয়া, যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহারই

বিপরীত দিক্‌কার একটা দ্বার খোলাইয়া লইতে বড় বেশী সময়ের দরকার হইল না!

সুজাতাকে ধরিয়া লইয়া যখন কোনও মতে বাহিরের উজ্জ্বল নির্ম্মল আলোকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন মনে হইল, দীর্ঘ কারাপ্রবাসের পর মুক্ত-বায়ুতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

যে দিকে জনতা কম ছিল, সেই দিকে আমরা সরিয়া আসিলাম। যুবকটীকে কহিলাম, আপনি এঁদের নিয়ে এখানে একটু বিশ্রাম করুন, আমি একবার আমার পিসিমা ও বৌদিদি ঠাকরুনকে খুঁজে দেখি।—এমন বিপদে আর পড়িনি কোনো দিন,—তবু আপনাকে পেয়ে বেঁচে গেছি!"

প্রায় একঘণ্টা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কোথায়ও তাঁহাদিগকে পাইলাম না। উদ্বেগে, আশঙ্কায় আমি একেবারে উন্মাদের মত হইয়া উঠিলাম। যুবকটী কহিলেন, "আমার মনে হয় তাঁরা আপনাকে খুঁজে না পেয়ে বাসায় চলে গেছেন;—সঙ্গে একটা ছেলে ছিল বল্‌ছিলেন না?"

—"সে যে একেবারেই ছেলেমানুষ; সে কি এই ভিড়ের মাঝ থেকে ওঁদের নিয়ে বেরুতে পেরেছে?"

এমন সময়ে ধরণীধর পাণ্ডাঠাকুরকে দেখিলাম তিনি ব্যস্তভাবে আমার দিকেই আসিতেছিলেন। দূর হইতেই কহিলেন, "ওঁদের আমি বাসায় রেখে এই ফিরে এলাম; প্রায় ঘণ্টাখানেক আপনাকে খুঁজে দেখ্‌লাম, মন্দিরের মধ্যে খুঁজ্‌লাম তারপর মনে কর্‌লাম আপনি ওঁদের না দেখে বাসায় চলে গেছেন—তাই গাড়ী

করে ওঁদের একদম বাসায় নিয়ে গেলাম,—চলুন আপনাকে গাড়ী করে দিচ্চি।”

আমরা সকলেই একত্রে বাহির হইয়া আসিলাম। যুবকটীর গাড়ী ঠিক্ ছিল। আমি তাঁহার নাম ও বাসার ঠিকানা জানিয়া লইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন,—“নিরর্থক! আপনি এত করে বল্‌ছেন কেন? আমি বিপদে পড়্‌লে কি আপনি আমার জন্য এটুকু কর্ত্তেন না?”—

পাণ্ডাঠাকুর গাড়ী লইয়া আসিলেন। দুইখানা গাড়ীই খানিকটা পথ পাশাপাশি চলিল। তারপর মোড়ের মাথায় আমাদের গাড়ী ভিন্ন পথ ধরিল। জানেলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া কহিলাম,—“নমস্কার—কাল দেখা হবে!”—“নমস্কার” —গাড়ী ছুটিয়া চলিল!

সুজাতা একবার মুখ বাহির করিয়া অন্য গাড়ীর দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। সে দিকেও একখানি পরম সুন্দর মুখের উজ্জ্বল হাসি দেখা যাইতেছিল!

গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সুজাতা গাড়ীর মধ্যে মুখ আনিল।

মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“এখন কেমন আছ, সু—?”

সুজাতা চকিতভাবে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল, পরক্ষণেই মাথাটী নিচু করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—“ভাল আছি এখন!”—

—“ভয় আর কর্‌চে না?” সুজাতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম।

সুজাতা কোনও উত্তর দিল না। শুধু একটি ম্লান হাসির রেখা মুহূর্তের জন্য তাহার পাণ্ডুর মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

আমি তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভয় করছে, সু—?—উত্তর চাই!"—

এই উত্তর দাবী করিবার মত জোর হঠাৎ যে আমি কেমন করিয়া পাইলাম, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

সুজাতা ধীরে ধীরে তাহার প্রশান্ত দুইটী চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য আমার মুখের উপর স্থাপন করিল; পর মুহূর্তেই চক্ষু নত করিয়া লইয়া নিজের পায়ের দিকে চাহিল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ নারীকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা পীড়ন করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষিত উত্তরটী জানিয়া লই।

কিন্তু আজ যেন অনেকখানিই পাইয়াছি, সেই প্রাপ্তির আনন্দ আমাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল।

ঠিক্ আমার সম্মুখের আসনে সুজাতা বসিয়া রহিয়াছে। তাহার সুগৌর মুখখানির উপর বিন্দু বিন্দু স্বেদ সঞ্চিত হইয়াছে। হাওয়ার বেগে চূর্ণকুন্তল উড়িয়া উড়িয়া ললাটের উপর লুণ্ঠিত হইতেছে! তাহার কুণ্ঠা, তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহাকে একটি মৌনশ্রীর মধ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। যেন জন্ম জন্মান্তরের পরিচয় কাহিনীটি তাহার সর্ব্বাবয়বে নিবিড় হইয়া রহিয়াছে।

তাহার কালো চোখের দৃষ্টিটুকু যেন আমার চির পরিচিত ;— মনে হয়, জন্ম জন্মান্তরের অন্ধ যবনিকা ভেদ করিয়া ধ্রুব তারার মতই ঐ দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করিতেছে। আমি স্তব্ধভাবে গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়া সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, ঐ সুনীল আকশ ভেদ করিয়া সেই চির পরিচিত দৃষ্টিটুকু আমার দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, এবং কখন সেই দৃষ্টিটুকু সরিয়া আসিয়া সুজাতার কালো চক্ষে আশ্রয় লইয়াছে।

সুজাতার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আনিলাম; দেখিলাম, আকাশের গায়ের সেই দৃষ্টিটুকু সুজাতার শান্তদৃষ্টির মধ্য দিয়া আমার মুখের উপরেই মুহুর্ত্তের জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে।

সুজাতা চক্ষু নত করিল।

গাড়ী আসিয়া ফটকের কাছে দাঁড়াইল। বাসার সকলেই সেখানে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

৬

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতেই সুজাতা যখন ক্ষুদ্র শয্যা খানির উপর উঠিয়া বসিল, তখন তাহার মনে হইল,যেন একটা অকারণ আনন্দ, একটা নূতন বিস্ময়, তাহার অন্তর মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

বাহিরের কোমল, নির্ম্মল অরুণালোক সদ্যোজাত শিশুর হাসিটুকুর মতই ফুটিয়া রহিয়াছে! আকাশে ছিন্ন, লঘু, মেঘ ছিল; নিদ্রা ভঙ্গের পর স্বপ্নের স্মৃতিগুলি যেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে মনের মধ্যে আনাগোনা করে, মেঘখণ্ডগুলিও নীলাকাশের গায়ে তেমনি ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

সুজাতা তাহার ঘরের জানালা খুলিয়া ফেলিল ; খানিকটা প্রভাতের কোমল আলোক মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া হাসিয়া উঠিল।

অন্তর যখন পরিপূর্ণ থাকে, তখন বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বানটা বুকের কাছে আসিয়া একটু বেশী করিয়াই সাড়া দিয়া উঠে! ভিতরে ভিতরে যে আনন্দ, পুলক, অনুভূতি, সমস্ত তুচ্ছতার গণ্ডী ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে, সে তাহাকে দুই হাতে বরণ করিয়া লয়, কোনও নিষেধ মানে না, কোনও বাধা গণ্য করিতে চাহে না।

বুকের মধ্যে এ যে কিসের আনন্দকে সুজাতা ধরিয়া বাঁধিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। একটা পুলক, একটা আনন্দহিল্লোল তাহাকে ছাড়াইয়া, ছাপাইয়া ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, এবং বাহিরের ঐ নীলাকাশের মধ্যে, নির্ম্মল আলোকহিল্লোলের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া লুটাইয়া দিতে চাহিতেছিল।

এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অজিত আসিয়া ডাকিল,—"দিদি—ও দিদি,—"

সুজাতা একমুখ হাসি লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল,—

অজিত কহিল, "আমার পড়বার ঘরে যাবি, দিদি?—" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া দিদিকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

"ছাড়্, ছাড়্, ওরে পাগল, আমি এম্‌নিই যাচ্ছি।—"

কিন্তু অজিত কথা শুনিল না; সুজাতাকে টানিয়াই লইয়া চলিল।

পড়িবার ঘরে ছোট টেবিলটার কাছে টানিয়া আনিয়া অজিত দিদিকে চেয়ারের উপরেই বসাইয়া দিল; এবং দিদিকে দেখাইবার জন্য দেরাজের ভিতর হইতে যে মহার্ঘ্য দ্রব্যটী টানিয়া বাহির করিল, সেটা একটা ছোট দূরবীন্!

"ওরে পাগল! দূরবীন্ নিয়ে এসেছিস্, ভেঙ্গে ফেল্‌বি যে।"—

যুদ্ধজয়ী বীরের মতই বুক টান করিয়া অজিত কহিল "তা ভাঙ্গলেই বা কি? ওটা যে আজ থেকে আমার!—আর সত্যি কি আমি ওটাকে ভেঙ্গে ফেল্‌ব?—দিদির যেমন কথা!—কেমন করে ওটা ব্যবহার কর্ত্তে হয়, কোথায় ওর কল কব্জা, আমি সবটাই যে শিখে নিয়েছি!"—

বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া সুজাতা এতক্ষণ অজিতের গর্ব্বোৎফুল্ল মুখের দিক চাহিয়া ছিল। সবটা শুনিয়া কহিল। "ওটা তোর কিরে?"—

"দাদাবাবু আমাকে দিলেন যে? ভারি জানিস্ তো তুই!" —কোঁচার খুঁট দিয়া একবার পরম যত্নে মুছিয়া লইয়া দূরবীন্-টাকে অজিত চোখের কাছে তুলিয়া লইল!—জানালার ফাঁক দিয়া নন্দন পাহাড় দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে বাগাইয়া ধরিল।

পুলকের আবেগে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "এই দেখ্,

মন্দিরটার গায়ে যে ছোট টীকটীকিটা রয়েছে, আমি তা'ও এখান থেকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

দুই হাতে অজিতকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া সুজাতা, কহিল, "তোকে দিলেন কিরে, অজু?"

"হাঁ, আমাকেই তো দিলেন,"—একটু গলা খাটো করিয়া কহিল, "ওই একদিন চেয়েছিলুম কিনা, যাবার দিন দিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কিন্তু আজ ভোরে উঠেই বল্‌লেন, 'এই নাও তোমার দূরবীন্'। দেখ্ দিদি, আমি তো প্রথমটা বিশ্বাসই কর্ত্তে পারিনি,—কিন্তু যখন কলকব্জা খুলে সব দেখিয়ে, বুঝিয়ে, দিলেন, তখন বুঝ্‌লাম, সত্যিই দিলেন।—কিন্তু দিদি, কেন দিলেন, তা' জানিস্?"

সুজাতার বুকের মধ্যে রক্তের প্রবাহটা একটু দ্রুত চলিতেছিল। সে অজিতের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

অজিত হাত ছাড়াইয়া লইতে লইতে কহিল—

"দেখ্ দিদি, আমি একটা মস্ত লোক হবই, তিনি বলেছেন! —দেখিস্ তা' আমি হবই!"—

"তা' তো হবি,—কিন্তু দূরবীন্ দিলেন কেন, বল্‌লিনেত?"—

অজিত তাহার ক্ষুদ্র রক্তাধর উল্‌টাইয়া কহিল, "ওঃ—সে—কাল যে মন্দির থেকে বৌদিদিদের নিয়ে এসেছিলুম্—তাই!"—

ও কারণটা যে দূরবীণ্ পাওয়ার পক্ষে খুব একটা মস্ত কারণ, তাহা তেমন করিয়া অজিতের মনে হইল না। সে দূরবীন্

তুলিয়া লইয়া জানেলার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং দুই একবার চোখে লাগাইয়াই দিদির দিকে ফিরিয়া কহিল—

"চল্ দিদি, ছাতে যাই, সেখান থেকে সব দেখ্‌ব।"

তখন দুইজনে ছাতে উঠিয়া আসিল।

ছাতে আসিয়া চঞ্চল অজিত দূরবীন্ ঘুরাইয়া নানা দ্রব্য দেখিতে লাগিল। সুজাতা একটা বেঞ্চের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দিদির উৎসাহহীন ভাবটা অজিতের এতক্ষণ লক্ষ্যই ছিলনা। এখন হঠাৎ কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি তুই একবারটী দেখ্‌বিনি?" এখান থেকে ডিগরিয়া পাহাড়ের গাছগুলি সাদা চোখে কলাই শাকের ক্ষেতের মতই দেখা যাচ্ছে, দূরবীণের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখ্ ওগুলি কত বড় বড় গাছ!"

দূরবীন্‌টা হাতে লইয়া সুজাতা ডিগ্‌রিয়া পাহাড় দেখিল, তার পর দূরবীণ ঘুরাইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল।

নন্দন পাহাড় হইতে কেহ নামিয়া আসিতেছিল; ছাতের উপর হইতে সাদা চোখে তাহাকে অনেকটা ছোট দেখা যাইতেছিল। সুজাতা দূরবীণ ফিরাইয়া নন্দনপাহাড়ের দিকে ধরিল। মন্দিরটা দেখিল, অর্জ্জুন গাছটা দেখিল, তার পর যে নামিয়া আসিতেছিল, তাহাকে দেখিল।

মুহূর্ত্তমাত্র;—সুজাতার দুই কর্ণমূল রাঙ্গা হইয়া উঠিল। দূরবীণ্‌টা হাতে রাখাও কষ্ট হইয়া উঠিল; তবুও আর একবার সেইদিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া দেখিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তে হাত বাড়াইয়া

দূরবীণ্‌টা অজিতকে দিতে যাইয়া সুজাতা দেখিল, পিছনে, স্মিতমুখে কেহ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দূরবীণ্ অজিতের হাতে পৌছিবার পূর্ব্বেই নবাগতের হাতে আসিল। দূরবাণ্ ছাড়িয়া দিয়া সুজাতা ছুটিয়া পালাইতেছিল; যে আসিয়াছিল সে বাঁ হাত বাড়াইয়া তাহার অঞ্চল টানিয়া ধরিল এবং ডানহাতে দূরবীণ্ ধরিয়া নন্দন পাহাড় হইতে কে নামিতেছে তাহাকে দেখিল। ততক্ষণ সুজাতা দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল।

অজিত আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—"বৌদি!"—'বৌদিদি' একটু হাসিয়া অজিতকে দূরবীণ্‌টা ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন,—"চল্ সুজাতা, জলখাবারগুলি ঠিক ক'রে সাজিয়ে দিবি!—ঠাকুরপো ঐ নন্দন পাহাড় থেকে হাওয়া খেয়ে ফিরে আস্‌ছে! খাবার না পেলে আমার কাঁচা মাথাটাই যদি দাবী ক'রে বসে!"

সুজাতা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। জেলের কয়েদীর মত কম্পিতপদে তাহার দিদিকে অনুসরণ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

৭

পরদিন বিকালের দিকে খানিকটা ঘুরিয়া বাসায় ফিরিতেই পিসিমা কহিলেন, "ওরে বিনু, বৌমার যে ভারি অসুখ করেছে; —তুই একবার তাকে দেখে আয়তো।"

"কই, আমি বেরিয়ে যাবার আগে ত কিছুই ব'ল্লেন না!"

... "ও তেমনি মেয়ে কিনা, একেবারে অচল না হলে কি আর শুতে চায়?"

আর কোনও কথা না বলিয়া বৌদিদির ঘরের কাছে গিয়া ডাকিলাম, "বৌদিদি!"—

বৌদিদি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "এই যে আমি এখানেই রয়েছি; আমাকে নাকি শুয়ে না থাক্‌লেই চল্‌বে না" এই কথা কয়টী বলিবার সময় অনুভব করিলাম, কথা বলিতে তাঁহার খুব বেশী কষ্ট হইতেছে।

ব্যস্তভাবে কহিলাম, 'তুমি হাস্‌ছ, বৌদি', তোমার চোখ মুখ যে একেবারে জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে; খুব বেশী অসুখ করেছে বুঝি? এখন কেমন বোধ করচ?"

আর একবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "না, এমন বেশী কিছু নয় ভাই, ও এখনি ঠিক্ হয়ে যাবে,—"

কিন্তু বৌদিদির উপেক্ষার হাসি দেখিয়া অসুখটা সারিয়া দাঁড়াইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। বরং দেওঘরের জল হাওয়াতে রোগ সারে, তেমন কেহ রোগে পড়ে না বলিয়াই যেন, যাহাকে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে একেবারে প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়াই ধরিল। দুদিনের মধ্যেই বৌদিদির মুখের হাসিটুকু একেবারেই নিভিয়া গেল, এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থায় মধ্যে যে দুই একটা ভুল কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, তাহা কেবলি গৃহস্থালীর কথায় ও সুজাতাকে গড়িয়া তুলিবার পরামর্শে পরিপূর্ণ!

ভারি ভয় পাইয়া গেলাম। পিশিমা আসিয়া কহিলেন, "ওরে, বৌমার তো অমন অসুখ কোনো দিনই দেখি নাই; তুই অজয়ের কাছে তার করে দে,—কি জানি' কি আছে কপালে!"

দাদার কাছে তার করিয়া দিয়া দেওঘরের যত কবিরাজ ডাক্তার আনিয়া জড় করিলাম। ঔষধ আসিল; ডাক্তারদের সৃষ্টিছাড়া আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। ঔষধের চেয়ে শুশ্রূষার উপরেই যে রোগিণীর জীবনমৃত্যু বেশী নির্ভর করিতেছে তাহা বুঝাইয়া দিতে তাঁহারা ত্রুটী করিলেন না।

সুজাতা সব কথা শুনিল, এবং নিঃশব্দে শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল। পিসিমা তাঁহার পূজার ঘরে মালা জপ করিতে বসিয়া গেলেন এবং মধ্যে মধ্যে বৌদিদির ঘরের কাছে আসিয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিসিমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন রাত্রি প্রায় এক প্রহর কাটিয়া গিয়াছে। সুজাতা বৌদিদির শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছিল। একটা ঈজি চেয়ারের উপর পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলাম। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল. উঠিয়া গেলাম। বৌদিদির পাণ্ডুর ঠোঁট দুইখানা একটু নড়িল; সুজাতা একটু বেদনার রস মুখে ঢালিয়া দিল, রসটা গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সুজাতা তাহার চকিতদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"কি হবে?"—

কথাটা বলিতেই তাহার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিল। প্রশ্নটা

জিজ্ঞাসা করার চেয়ে, প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা যে কত কঠিন, তাহা সুজাতা এ কয়দিনে বেশ বুঝিয়াছিল। তাই সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বের মতই আবার পাখা করিতে লাগিল এবং মধ্যে একবার মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া লইল।

ঐ একটী ক্ষুদ্র বালিকার কাছে এ কয়দিনে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণটা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। দুই হাত পাতিয়া তাহার নিকট হইতে ক্রমাগতই ঋণ গ্রহণ করিয়া করিয়া নিজকে একেবারে ডুবাইয়া দিতেছিলাম; ঋণ গ্রহিতার যদি মনে মনে সঙ্কল্প থাকে যে, সে কোনও দিনই গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিবে না, তাহা হইলে যেমন অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্রমাগতই ঋণ গ্রহণ করিতে থাকে, আমিও ঠিক তেমনি সুজাতার কাছে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ গ্রহণ করিতেছিলাম। কোনও দিন শোধ করিতে পারিব এমন আশাও ছিল না, শোধ করিবার তেমন মতলবও বুঝি ছিল না।

এ কয়দিন পর্য্যন্ত ঐ ক্ষুদ্র বালিকাকে বৌদিদির শিয়রে দেখিতেছি। কি ক্লান্তিবিহীন, বিশ্রামহীন সেবা! আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতাম যে, অতটুকু বালিকা কেমন করিয়া রাতদিন ঐ আনন্দহীন রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত এবং রোগীর ঠোঁটের প্রত্যেক কম্পনটি পর্য্যন্ত নির্নিমেষনয়নে লক্ষ্য করিত। এত উদ্বেগ বুকের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াও সে যে কেমন করিয়া অমন শৃঙ্খলার সহিত নিপুণ হস্তে প্রত্যেকটী কাজ করিয়া যাইত, তাহা আমি বুঝিতেই পারিতাম না।

ঔষধটা খাওয়াইয়া দিলাম, বোধ হয় বুকে একটু বাধিল।

হঠাৎ কেমন অস্থিরতা চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল; পরক্ষণেই মুখ-খানা একেবারে বিবর্ণ, রক্তহীন হইয়া গেল।

সুজাতা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দিদি যে একেবারে কেমন হয়ে প'ড়লেন, দেখুন ত!"

"অতটা অস্থির হলে ত চল্‌বে না, আমি চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছি, তুমি বাবাকে ডেকে আনত সুজাতা! যাও—যাও!"—

সুজাতা যাইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না; শুধু একবার ঘাড় বাঁকাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না, আমি এমন অবস্থায় দিদিকে ফেলে যেতে পার্‌ব না।"—এই বলিয়া সে বেশ শক্ত হইয়া বসিয়া জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

এত যে বিপদ, তবু আমার মনে হইতে লাগিল ঐ মেয়েটী যেন তাহার ঠিক যায়গাখানিই দখল করিয়া বসিয়াছে, এবং সে যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া উঠিয়া না যায়, তাহা হইলে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়ার উপায় নাই।

বোধ হয় আমি আমার নিজের অন্তর থেকেই তাহাকে ঐ আসনখানি ক্রমেই ছাড়িয়া দিতেছিলাম, এবং তাকে সেখানে অধিষ্ঠিতা দেখিবার আনন্দ, কল্পনাতেই খানিকটা অনুভব করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাই, যখন অধিকার পাওয়ার পূর্ব্বেই তাহাকে ঐ যায়গাটিতে দেখিলাম, তখন ওটা যে তার প্রাপ্য নয়, অথবা সে যে ওখানটা দখল করিবার অধিকার এমনভাবে এখন পর্য্যন্ত পায় নাই, একথাটা একবারটীও আমার মনে হইল না।

দুই তিনবার জলের ঝাপ্‌টা দিতেই অস্থিরতার ভাবটা কাটিয়া গেল। সুজাতা তখন পাখাটা আমার দিকে সরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত পরেই বাবাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

৮

বোধ হয় সুজাতার প্রাণপণ সেবাতে পরিতুষ্ট হইয়াই মরণের দেবতাটী বৌদিদিকে পায়ে ঠেলিয়া রাখিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার পাদস্পর্শটাও তো তেমন কোমল নহে। তাই নিরাময় হইবার অবস্থায় পৌঁছিয়াও কিছু দিন পর্য্যন্ত এমনি দুর্ব্বল, কাতর রহিয়া গেলেন যে, পাশ ফিরিয়া শুইবার শক্তিও রহিল না।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, এ যাত্রায় যে ইনি বাঁচিয়া গেলেন, সে কেবল এই অক্লান্ত পরিশ্রমী মেয়েটিরই শুশ্রূষার গুণে এবং এমন নিপুণ শুশ্রূষা তিনি তাঁহার দীর্ঘ ডাক্তারীর অভিজ্ঞতার মধ্যে আর কোনও দিনই দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার চলিয়া গেল বৌদিদি আমার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "আলাউদ্দিন রাজপুতদের আক্রমন করেছিল বলেই না, প্রমাণ হয়ে গেল, যে, রাজপুতের মেয়েরা কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে এবং কতটা নির্ভয়ে আগুণের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মর্‌তে পারে! আমার অসুখ হয়েছিল বলেই না প্রমাণ হয়ে গেল যে, এই দুধের মেয়েটাও কতখানি শক্তি রাখে, সেবা কর্ব্বার ও শুশ্রূষা কর্ব্বার!"—কথাটা বলবার সঙ্গে বৌদিদির মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিটুকু তাঁহার রোগশীর্ণ মুখের

উপর তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের পাণ্ডুর লেখার মতন প্রতীয়মান হইতেছিল

"তা' বাহাদুরীটা কার?—আলাউদ্দীনের আক্রমণের? না—রাজপুত মেয়েদের পুড়ে মরার?"—

"তুমি তো বল্‌বে রাজপুত মেয়েদের পুড়ে মরার বাহাদুরীটাই বেশী—কেমন নয় কি?"—

"ঠিক বিচার কর্‌তে হলে তো তাই বল্‌তে হয়, কেমন সু—?" —সুজাতার নামটা হটাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, কথা ফিরাইয়া লইয়া কি যে বলিব স্থির করিবার পূর্ব্বেই বৌদিদি কহিলেন,—

"চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা;—ওগো কর্ত্তা, আলাউদ্দীনের আক্রমণ না হ'লে যে রাজপুত মেয়েদের ওসব পুড়ে মরাটা কিছুই হত না, ইতিহাসেরও এ বাহাদুরীটা পেতে হ'ত না"—

যখন তর্কের আসরে নামিয়া সুজাতার পক্ষই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি, তখন লজ্জায় পড়িয়া হঠাৎ ফিরিবার ইচ্ছা হইল না।

কহিলাম, রাজপুত মেয়েদের ভিতর পুড়ে মরার শক্তি ছিল বলেই না তারা পুড়ে মর্ত্তে পেরেছিল, নইলে কত যায়গায় তো দেখা গেছে,—"

বাধা দিয়া বৌদিদি কহিলেন, "ওগো উকিল মশাই, থাক্ আর বেহায়াপনা কর্‌তে হবে না, বিষ্টে বোঝা গেছে; সুজাতারই জয় জয়কার হোক্;—কি বলিস্‌রে, সুজাতা!"

তর্কের মাঝখান থেকে বৌদিদি তো পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেনই; কিন্তু

পরাজয়ের সমস্ত লজ্জাই যে আমার উপরেই চাপাইয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল।

সুজাতার দিকে চাহিলাম, তাহার চোখমুখ অসম্ভব রকম লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে আঁচলের একটা খুঁট তুলিয়া লইয়া সে ক্রমাগতই আঙুলে জড়াইতে লাগিল।

কিন্তু বৌদিদির নিষ্ঠুরতার সীমা ছিলনা। হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে কথা যাক্, সুজাতা যে বায়না ধরেছে তার একটা ব্যবস্থা ত আমাকে কর্ত্তে হয়!"

মুখশ্রী যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কথাগুলি বলিয়া গেলেন; আমার নিজের অবস্থাটা কিন্তু নিতান্তই শোচনীয় হইয়া উঠিল। বুকটা একটু কাঁপিতেছিল, একটু গলাটা ঝাড়িয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম,—

"কি রকম?"—

"এ কয়দিন তো তুমি ঠাকুরের রান্না খেয়েছ, ও আর সেটা মোটেই পছন্দ করছে না। বুঝ্‌লে, গোঁসাই?"

"গোঁসাই কি কর্‌বে তার?—তুমি উঠে পাক কর্‌বে নাকি?"
—কথাটা ঠিক মানাইল না বুঝিলাম। একটু জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলাম।

"তা' নয় কর্ত্তা, ঐ প্যান্‌পেনে মেয়েটা মাথা খাচ্ছে আমার, ও তোমার জন্যে পাক কর্‌বে;—তোমার খাওয়া ভাল হয় না, এজন্য যে ওর দরদের অন্ত নেই!"—

সুজাতা পাখা ফেলিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বৌদিদি

কহিলেন, "ওরে কলিতে তো কারু ভাল কর্‌তে নেই,—তোর আর্জি পেশ্ কর্ত্তে আমার মাথা কেটে যাচ্ছে আর তুই কিনা একটু হাওয়া দিচ্ছিলি, পাখাটা ফেলে চলে যাচ্ছিস্!"

সুজাতা রাগিয়া গিয়াছিল; বক্রদৃষ্টিতে একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়াই গেল!

বৌদিদি হাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূর্‌বীন্ হাতে অজিত আসিয়া হাজির হইয়া কহিল, "দাদাবাবু, আজ রাস্তায় ভারি একটা মজা হয়ে গেছে;—ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সাহেব কোথা থেকে সাইকেল ছুটিয়ে আস্‌ছিল, পথের ওপর একটা ষাঁড় ছিল, বেল্ দিতেই সেটা হটাৎ ক্ষেপে উঠ্‌ল, সাহেব সাম্‌লাতে না পেরে সাইকেল থেকে পড়ে গেল। রাস্তায় অনেক লোক ছিল, কেউ বা হেসে উঠ্‌ল, কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল; আমি ছুটে গিয়ে সাহেবকে ধর্ত্তেই, সাহেব হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে দাঁড়াল। লেগেছে কিনা জিজ্ঞেসা কর্‌তেই সাহেব আমাকে পরিষ্কার বাঙ্গলায় তাঁর যে লাগেনি তা' বল্‌লেন! সাহেবরা এমন বাঙ্গালা কি বল্‌তে পারে দাদাবাবু? আমি শুনে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।"

"বটে তুই যে সাহেবকে ধর্‌তে গেলি,তোর ভয় কর্‌ল না?"—

"ভয় কর্‌বে কেন দাদাবাবু? ওতো মাটীতে প'ড়ে গড়াচ্ছিল; হেঁটে চ'লে যাচ্ছে,—সে সাহেবকেও আমি ভয় করিনে!"—

অজিত একটু বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল! কথা

শুনিয়া বৌদিদি হাসিয়া উঠিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাহেব তোকে আর কি বল্লেরে ?"—

"সাহেব আমাকে তার কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে তার মেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ;—ঠিক্ আমার সমান বয়সী একটা ছেলে আছে, সে মেমসাহেবের ছোট ভাই। কিন্তু সে বোধ হয় আমার সঙ্গে জোরে পারে না ; তার হাতের কব্জি আমি টিপে দেখেছি ; খুবশক্ত—কিন্তু তা হলেও পাঞ্জা কষে, আর দেওয়ালের গায়ে ঘুসি ঠুকে আমি যা' হাত শক্ত করে তুলেচি ; আমার সঙ্গে আর পারতে হয় না !"—

"অবাক্ করলি যে অজিত, তুই এত কাণ্ড করে এলি সাহেবের কুঠিতে যেয়ে !—"

"মেম আমাকে রোজই যেতে বলেছে। মেমের একটি মেয়ে আছে ; বৌদিদি, তোমার গায়ের রং সোণার মত, কিন্তু তার গায়ের রং ঠিক দুধের মত সাদা। চুলগুলি সোণালি রং এর, তোমার চুলের মতন এমন কালো,—এমন সুন্দর নয় !"—

"তুই তাকে বিয়ে করবিরে, অজিত ?"

"দুঃ—বৌদির যে কথা ! দেখুন্ তো দাদাবাবু, দুরবীণটার এই স্ক্রুটা আমি কিছুতেই খুল্‌তে পারলুম না !—দিদি সেদিন ছাতের উপর বসে এম্‌নি জোরে জোরে মোড় দিচ্ছিল, যে এখন আর খোলাই যাচ্ছে না।"

"ছাতের উপর তোর দিদি দুরবীন্ দিয়ে কি কচ্ছিলরে ?" হঠাৎ বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তাই বলি আর কি ?"—অজিতের মুখে একটু দুষ্টু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"বল্ না লক্ষী ভাইটী।"

"কি দেবে আমাকে ?"—

আচ্ছা, তোকে এই—আমার সেই ষ্টাইলো পেন্‌টা দেব।"

"কই দাও,"—এই ষ্টাইলো পেন্‌টার দিকে অনেক দিন হইতে অজিতের যে একটা লুব্ধ দৃষ্টি ছিল, তাহা বৌদিদি জানিতেন।

"না দিলে তুই বল্‌বিনে ?—যা, তবে তোকে আর দিলুম না।"—বৌদিদি অন্য কথা তুলিবার চেষ্টা করিতেই লুব্ধ অজিত বলিয়া উঠিল, "দিদিকে বলোনা কিন্তু দিদিমণি; দাদাবাবু নন্দন পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন, দিদি তাই দেখ্‌ছিল ওই দূরবীন্‌টা দিয়ে!"—

"আরে পণ্ডিত, তুমি দিদির নামে বানিয়ে বল্‌চ,—আসুক সুজাতা, আমি তাকে বলে দিচ্ছি!"

অজিত একটু অপ্রতিভ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তারপর যখন দেখিল, ষ্টাইলো পেন্‌ও হাত ছাড়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দিদির গালি খাবার পথও তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে, তখন সে রুখিয়া উঠিয়া নিতান্ত নিরুপায়ের মতই বলিয়া ফেলিল;—

"চাইনে তোমার ষ্টাইলো পেন;—ভারিত জিনিষ; ওর একটা আমি বড় হ'লে কিনে নেব।"

বড় হইলে কিনিয়া লইবে মনকে এ প্রবোধটা দিয়াও কিন্তু তাহার চোখের কোণে জল আসিতেছিল। কারণ যে জিনিষটা

সভই পাওয়া যাইতেছিল, তাহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যই পিছাইয়া গেল!

পর মুহূর্ত্তেই যখন বৌদিদি তাঁহার বালিশের নিম্ন হইতে সেই অপূর্ব্ব দ্রব্যটি বাহির করিয়া অজিতের সম্মুখে ধরিলেন তখন লুব্ধ অজিত এত বড় অপমানটাকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া গেল এবং একেবারে ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে কলমটা লইয়া বাহির হইয়া গেল!

বৌদিদি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ!"

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত টেবিলের উপরকার এটা ওটা নাড়িতে লাগিলাম। বৌদিদিকে কিছু বলা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিলে সব দিক্ রক্ষা হইবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিলাম। শীর্ণ, পাণ্ডুর ললাটের উপর স্বেদবিন্দু ফুটিয়া রহিয়াছে। একটু হাসিয়া একটু কথা বলিয়াই যেন বড় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন মনে হইল। পাখাখানা তুলিয়া লইয়া একটু হাওয়া দিতেই বৌদিদি কহিলেন, "ওমা, ওকি! ছিঃ, হাওয়া দেওয়ার দরকার নেই তো!"

তাঁহাকে শশব্যস্ত দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিলাম, "কই, এত-দিন বলনি ত, বৌদি?"

মুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন বল্‌বার শক্তি থাক্‌লে বল্‌তাম বই কি! কিন্তু তবু মনে হয় ভগবান্ যে এতখানি

অসুখ দিয়েছেন, কষ্ট দিয়েছেন, এরও যথেষ্ট আবশ্যক ছিল। যেখানে পাওয়ার দাবী আছে, সেখান থেকে যথেষ্ট পেলেও সেটা প্রাপ্যর সীমানার মধ্যেই থেকে যায়,—ছাড়িয়ে যায় না; কিন্তু যেখানে কিছুই পাওয়ার দাবী ছিল না, সেখান থেকে এত-টাই পেয়েছি যে, সেই পাওয়াটা আমার একটা খুব বড় সমস্যার মীমাংসা করে দিয়েছে।"

বৌদিদির কথাগুলি যে আমার কাছে নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হইল, এমনটা বলিতে পারি না, যেহেতু আমার মনের মধ্যে ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই এমন কতকগুলি কথা বৌদিদিকে বলিবার জন্ম জাগিয়া উঠিয়াছিল, যাহা এই কথাগুলির সঙ্গেই অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কান্বিত।

বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, "বেশ তারপর ?"—

তিনি কহিলেন, "আগে পাখাটা রাখ, পরে বল্‌চি!"

"আচ্ছা হাওয়াটা না হয় আমি নিজেই খেলাম।"—

বৌদিদি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "সোণা খাঁটি কিনা জান্‌বার জন্ম মানুষকে সত্যিই অনেকখানি বেগ পেতে হয়। শুধু বাহিরটা দেখে যদি মানুষ সোণা চিন্‌তে পার্‌ত কোনও কথাই ছিল না; কিন্তু তা'তো হয় না ঠাকুরপো; দুঃখের কষ্টিপাথরের উপর তাকে কত করেই যে কষে দেখতে হয়। নইলে প্রায়ই সোণা বলে মানুষ আদর ক'রে পেতল ঘরে নিয়ে যায়—"

"তারপর সিন্দুকে উঠিয়ে রাখে, এই ত ?"

"না, গলায় পর্‌তে চায়; কিন্তু দু'দিন না যেতেই সবাই ধরে

কেলে, যা' এত করে নিয়ে আসা হয়েছে তা' সোণা তো নয়ই ; পেতল বা গিল্টি !"

হাওয়া যে কোন্‌দিকে বহিতেছে, তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না, কিন্তু তবুও হঠাৎ মুখরের মতই বলিয়া ফেলিলাম, "খাঁটি সোণা তুমি কিছু পেয়েছ নাকি ?"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বুঝি আর তর সইছে না, কেমন ? হাঁ, খাঁটি সোণা আমি কিছু পেয়েচি, এবং এই অসুখের মধ্যেই সোণা খাঁটি কিনা তা' আমি পরখ করে বাচাই করে নিয়েছি।"

"তবে আর কি, এখন নেক্‌লেস্ তৈরী করে ফেল ;—আর বাপু, এত বাজে বক্‌তেও পার তুমি !"

"তা আমার পাওয়া সোণা দিয়ে যা'ই আমি তৈরী' করি না কেন, এটা ঠিক বলে রাখলাম, যে, যার গলায় আমার তৈরী জিনিষ আমি ঝুলিয়ে দেব তা তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে,"—

তর্ক করিতে করিতে দুই পক্ষই সময়ে সময়ে এমন একটা যায়গায় আসিয়া পৌছে, যেখানে উভয় পক্ষই হঠাৎ থামিয়া যায়, এবং তর্ক বন্ধ করিয়া দেয়। আমাদের কথাগুলি এতদূর অগ্রসর হইলে বৌদিদি হঠাৎ থামিয়া গেলেন, আমিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও কথা বলিতে পারিলাম না।

তারপর হঠাৎ কখন যে এক সময়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিলাম, তাহা নিজেও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

৯

আমার এমন কতকগুলি কাজ ছিল যাহা বৌদিদি নিজে দেখিয়া গুছাইয়া করিয়া না রাখিলে আমার কিছুতেই মন উঠিত না! বৌদিদি ছাড়া আর কেহ যে সে কাজগুলি তেমন করিয়া করিতে পারে এ বিশ্বাস আমার ছিল না। মা-মরা ছেলেগুলি যেমন সময়ে সময়ে আত্মীয় বিশেষের কাছে অতিরিক্ত আদর পাইয়া একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, আমার অবস্থাটাও তেমনি হইয়াছিল। ছেলেবেলায় মা স্বর্গগত হইলেন, তারপর হইতেই বৌদিদির কাছে অতিরিক্ত আদর পাইয়া পাইয়া নিজের ছোটখাট কাজগুলিও আর করিয়া লইতে পারিতাম না।

সুতরাং বৌদিদি ব্যারামে পড়া অবধি আমার থাকিবার ঘরটার চেহারা এমনই বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল, যে, তাহা আমার নিজের কাছেই অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছিল। কিন্তু গুছাইতে যাইয়া জিনিষপত্রগুলিকে আরও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতাম। ক্রমে বই খাতাপত্রগুলি বিছানার উপরেই স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল; শুইবার দরকার হইলে সেগুলি একপাশে সরাইয়া কোনও মতে একটু যায়গা করিয়া লইতাম। টেবিলের উপর রাজ্যের জিনিস জড় হইতেছিল; বিশৃঙ্খল খাতাপত্রগুলির মধ্যে কয় তারিখের আধ-খোলা খবরের কাগজ; কতকগুলি ঔষধের শিশির পাশে কালীশূন্য দোয়াত দুইটা; কলমদানীর উপর মণিব্যাগটা; এক-পাশে ছাতিটা ও বেড়াইবার লাঠিগাছটা; ছাতিলাঠির উপরেই খাবারের রেকাবীখানা; পাশেই একটা কোট্ ও একটা গেঞ্জি; যে কোনও একটা জিনিষ ধরিয়া টান দিলেই আর পাঁচটা পড়িয়া

যায়। আলনার কাপড়গুলি চেয়ারের উপর স্তূপীকৃত; জুতাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; মনে হয় ঠিক যেন জার্ম্মাণ আক্রমণের পরের অবস্থা।

বহুদিন পরে সেদিন একটু নন্দনপাহাড়ের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার ঘরটা কে সাজাইয়া, গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। বিছানার কালীমাথা চাদরের স্থানে ধোলাই চাদর আস্তৃত রহিয়াছে। বইগুলি সেল্‌ফের উপর উঠিয়াছে। খাতাগুলি টেবিলের উপরে, চিঠিপত্র-গুলি লেটার কেসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কাপড়জামাগুলি আলনায় শোভা পাইতেছে। চেয়ারটা টেবিলের কাছে রহিয়াছে, অন্য ঘর হইতে একটা ছোট চেয়ার আনিয়া জানালার কাছে রক্ষিত হইয়াছে; টেবিল ল্যাম্পের কালীটা কে সযত্নে মুছিয়া ঠিক করিয়াছে। এবং শয্যার কাছেই টীপয়টা রাখিয়া, তাহার উপর জলের গেলাস, পানের ডিবাটা গুছাইয়া রাখিয়াছে। আর এক-খানা ছোট টীপয়ের উপর বিকালের জলখাবারটা ভোক্তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

কোথায়ও এতটুকু ত্রুটী নাই;—বৌদিদির নিপুণ হস্তের পরিচয়টী যেন আমি প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই দেখিতে পাইতে-ছিলাম। কিন্তু তবু এটাতো নিশ্চিত, যে বৌদিদি তাঁহার শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কিছু আর এতগুলি কাজ করিতে পারেন নাই।

সুতরাং এ যে সুজাতারই কর্ম্মকুশলতার পরিচয়টী; প্রত্যেক

কার্য্যের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।

এই সাজান গুছান প্রত্যেকটী কার্য্যই যেন আমাকে অভ্রান্ত ভাষায় জানাইতেছিল,—"সে কত নিপুণ, কত সুন্দর যে এমনি করিয়া বুকের দরদ দিয়া কাজ করিতে পারে।"

রূপ কথার রাজকন্যা যেমন কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে তাহার গোপন স্থান হইতে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া আসিয়া, তাহার কোমল, নিপুণ পদ্মহস্তের স্পর্শ দিয়া প্রত্যেক জিনিষের উপরেই লক্ষ্মীর আলিপনা শ্রী ফুটাইয়া দিয়া আবার তাহার নীরব গোপ-নতার মধ্যে ফিরিয়া যায়;—এও তেমনি আজ আমার এই মলিন বিশৃঙ্খল কক্ষটীর সমস্ত কুশ্রীতাকে দূর করিয়া দিয়া কোথায় আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তখনি, এত যে করিয়াছে, সে ঐ পাশের ঘরটীর মধ্যেই আছে, এবং আমি ইচ্ছা করিলেই এই মুহূর্ত্তেই যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতে পারি, এই অতি সত্য কথাটী বার বার মনে পড়িয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা নিবিড় পুলকস্পন্দন সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল!

রূপকথার রাজকন্যা কোন এক সার্থক, শুভ মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত গোপনতার খোলস দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া মুক্ত হইয়া ধরা দিয়াছিল; এমনটা কি হইতেই পারে না, যে, ঐ নারী, যে রাজকন্যাও নহে, রাজবধূও নহে, শুধু সাধারণ গৃহস্থ ঘরেরই কন্যা, সেও একদিন তেমনি করিয়া ধরা দিবে?

সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। ছোট খাট সমস্ত দ্রব্যগুলির সঙ্গেই যেন একটা নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিয়া লইতেছিলাম!

তাহারা যে, দুইখানি কর্ম্মনিপুণ পরমশুভ্র, কোমল হস্তের সযত্ন স্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে!

বৌদিদির ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌদিদি তুমি কি ইন্দ্রজাল জান?"

"কেন, কি হয়েছে ঠাকুরপো?"

"বিছানার উপর উঠে বস্‌বে, সে শক্তিও তো তোমার নেই দেখ্‌ছি; কিন্তু আমার ঘরের চেহারা অমন বদ্‌লে গেল কি ক'রে?"

কি আশ্চর্য্য দুটি চক্ষু! চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়া যে অমন করিয়া স্নেহ রক্ষিত হইতে পারে তাহা আমি আর দেখি নাই! বৌদিদির চোখ দু'টি হাসিতেছিল, কিন্তু চোখের পাতা যে জল-ভার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি কোনও মতেই গোপন করিতে পারিলেন না।

মনে হইল বর্ষার জলসিক্ত তরুণ পল্লব-শীর্ষে প্রভাতসূর্য্যের কোমল, নির্ম্মল আলোকরেখা পড়িয়া হাসিতেছে। "তা, হবে, বোধ হয় যাদু কিছু জানি; কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে উঠে গিয়ে একটু দেখ্‌বো সে শক্তিও ভগবান্ রাখেন নি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তোমার খাবার খেয়ে এসেছ?—ও ঘরেই তো রাখতে বলেছিলাম। আচ্ছা এখানে

আমার কাছে বসেই খাবে ;—হাত মুখ ধুয়ে এস ! —সুজাতা,—ও সুজাতা !—

আমি যে ঘরে আছি, সুজাতা তাহা জানিতে পারে নাই। পাক ঘরের দিক হইতে উত্তর দিল, "দিদি. ডাক্‌ছ কি ?"—

তার পরই পায়ের শব্দ পাইলাম। ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইব মনে করিলাম কিন্তু এর মধ্যেই সুজাতা আসিয়া পড়িল।

—"আলুগুলি কুটে ঠিক কর্‌ছিলাম দিদি ;—তোমার কিছু চাই ?" হঠাৎ পাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে আরও এক জন রহিয়াছে, যাহার আগমন সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।

অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া, গায়ের কাপড়টা যদিও সুসংবৃত ছিল তবুও আর একটু টানিয়া ঠিক করিয়া দিল ; এবং বৌদিদির বিছানার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া নীরবে আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল !

ঠিক একখানি আনন্দ প্রতিমা ! অন্তঃপুরের স্বচ্ছন্দতার মধ্যে তাহাকে এমন করিয়া আর কোনও দিনই দেখি নাই। অযত্ন-বিন্যস্ত কালো চুলের রাশি ঢেউ খেলিয়া, পিঠ ছাড়াইয়া নামিয়াছে ; কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে সে যে নীল সাড়ীখানি আঁটিয়া, জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার নিটোল সৌন্দর্য্য সবখানি ফুটাইয়া তুলিয়াছে ! সুগৌর ললাটের উপর স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছে এবং লজ্জারক্তিম কপোলের পাশে কর্ণভূষা দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে এমন একটা অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছে, যাহা বুঝাইয়া দেওয়াটাই সব চেয়ে বড় মুস্কিল !

—"ও কিরে, জুজু দেখ্লি নাকি? ঠাকুরপোর খাবার বুঝি ওঘরে রেখেছিস্? এ ঘরে নিয়ে আয় তো!"

সুজাতা ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

"বৌদি, এ বেচারাকে তুমি ওমন করে খাটাচ্ছ যে? পরের মেয়ে—নিজের ঘরে ওর কিচ্ছুটি কর্‌বার নেই, কিন্তু এখানে তো তুমি ওকে একদণ্ডও বিশ্রাম দাও না!—"

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "আমি কি ওকে খাটুতে বলি? ও কিছুতেই ছাড়বে না; ঠাকুরের রান্না তুমি পছন্দ কর না বলে ও যে নিজেই পাক কর্‌তে সুরু করেচে! এ যে কি আশ্চর্য্য মেয়ে, মুখে বেশী কথা বলে না, কিন্তু এম্‌নি করেই দুদিনের মধ্যে পরকে আপন করে নিতে পারে, যে আমি ভেবে অবাক্ হয়ে যাই! কাজ কর্ম্ম শেখ্‌বার জন্য ওর যে কি আগ্রহ, এবং কত দ্রুত যে ও সব আয়ত্ত করে নিতে পারে! আমি তো ঐটুকু মেয়ের কাছে হার মেনে গেছি। বাপের বাড়ী যা কিছু শিখেছিলাম, ও তা সবই তো থলে ঝেড়ে নিয়েচে, এখন কি শিখিয়ে যে ওর আগ্রহ মেটাব তা আমি বুঝ্‌তে পারিনে।—"

হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া ফেলিলাম,—"তোমার কথাগুলি কেমন শোনাচ্চে জান?—"

বৌদিদি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি!—"

"ঠিক্ যেন বোনের ঘটকালি কর্‌চ, এম্‌নিতর শোনাচ্চে"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জা করিতে লাগিল।

—"তা যদি শোনায় তা'তেই বা ক্ষতি কি? অমন লক্ষীর

মত বোনের ঘট্‌কালি কর্‌তে লজ্জা হবার কোনও কারণই নেই তো! আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি ওর বিয়ের ঘট্‌কালিটা কর্‌ব এ ইচ্ছাটা অনেকদিন থেকেই আমার মনে মনে রয়েচে! —তোমার কাছে আর বল্‌তে বাধা কি?—তা তুমিও একট চেষ্টা ক'রে দেখ না কেন?"

শেষ কথা কয়টা বৌদিদি ধীরে ধীরে হাসিয়া হাসিয়া বলিয়া গেলেন।

"নাঃ—তা'তে আর কাজ নেই, ঘট্‌কালির বিদায় নিয়ে মহা গোল বেধে যাবে!" ঠিক এখনি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িলে হয়তো পরাজয়ের কলঙ্কটা গায়ে মাখিতে হইবে না মনে করিয়া, 'দুয়ারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া গেলাম। কিন্তু ঠিক তখনি সুজাতা খাবারের রেকাবী ও জলের গেলাসটা হাতে করিয়া দুয়ারের কাছে দেখা দিল!

কিন্তু বৌদিদি তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, সুজাতার বিয়ের ঘট্‌কালিটার বিদায় আমি একাই নেব, কিন্তু মনে রেখ, ইন্দিরা বামনীর হুকুম এখন পর্য্যন্ত কেউ ওল্‌টাতে সাহস করেনি।"

"শুধু দাদা ছাড়া,—নয়!"—বৌদিদি এমন একটা তীক্ষ্ণ বাণের আশা করেন নাই; কিন্তু সাহসী সৈনিকের মতই দুই হাতে তাহা ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন,

—"না তিনিও না।"—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন।

—"বটে, প্রমাণ আছে কিছু?"—

"প্রমাণ চাই!—আছে বই কি?"—বলিয়া বালিশের নীচ হইতে একখানি খাম বাহির করিয়া, হাত বাড়াইয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন।

খামের উপরে দাদার হস্তাক্ষর—বৌদিদির নাম লেখা।

"এ ইন্দিরা দেবীর চিঠি,—আমি এ নিয়ে কি কর্‌ব?"

বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "পড়।" সুজাতা খাবারের রেকাবী টেবিলের উপর রাখিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দিকে একবার চাহিয়া চিঠি পড়িলাম।

চিঠিতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা ছিল:—"সুজাতাকে তুমি যদি চাওই, আমার তাতে আর আপত্তি কর্‌বার কি থাকৃতে পারে? তুমি যাকে পছন্দ করেচ, সে যে তোমার সংসারকে আনন্দ-নীড়ে পরিণত কর্‌তে পার্‌বে, এ বিশ্বাস আমার খুবই আছে। বিনু নিশ্চয়ই ওকে পছন্দ কর্‌বে। তুমি যাকে দেবে, তাকে যে সে মাথায় করে নেবে তা' আমি জানি! তবু তাকে একটিবার জিজ্ঞেস্ কর্‌বে কি? তোমার চিঠি পেলেই আমি সুজাতার বাবাকে লিখ্‌ব!"—

সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুতের প্রবাহ যেন প্রবল-বেগে বহিয়া গেল। চিঠিটা বৌদিদিকে ফিরাইয়া দিবার সময় হাতটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঁপিতেছিল। বৌদিদি সেটুকু লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—'কেমন প্রমাণ পেলে ত?—এখন বল ত মাথায় ক'রে নেবে কি না?"—

একটু সামলাইয়া লইয়া কহিলাম,—"দাদা বুঝি তোমায় মাথায় করে নিয়েছেন, বৌদি ?"—

"ছিঃ ভাইটি, দিদিকে কি অমন কথা বলতে আছে ?"—

গালি খাইয়া হাসিলাম, এবং একটু অগ্রসর হইয়া দুই হাতে বৌদিদির পায়ের ধূলা লইলাম।

স্নেহ তরলকণ্ঠে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন,—অত্যন্ত মৃদুস্বরে, —"সুজাতাকে পাওয়ায় সৌভাগ্য হোক্ !"—

আমি দুই কাণ ভরিয়া বৌদিদির আশীর্ব্বাণী অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিলাম।—

১০

সুজাতাকে পাওয়া যে সত্যই একটা সৌভাগ্য, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমি বুঝিতেই পারিতাম না যে, এত দর্শন বিজ্ঞান যে ঘাটিয়াছে, সেক্সপীয়র কালিদাস কণ্ঠস্থ করিয়াছে, তাহার কাছেও ঐ অতটুকু একটি অর্দ্ধশিক্ষিতা বালিকাকে জীবনসঙ্গিনী-রূপে পাওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইবে কেন ?

উহার নীলসাড়ীর বেষ্টনীর মধ্যে, উহার দোদুল্যমান কর্ণভূষার অন্তরালে, উহার লজ্জারক্তিম সুগৌর কপোলের কাছে কাছে, উহার নিবিড় সংসর্পিত কালো চুলের রাশির মধ্যে, উহার কালো চোখের গভীর দৃষ্টির মধ্যে, উহার হাস্যোজ্জ্বল অধরপুটের পাশে পাশে, এমন কি আকর্ষণ থাকিতে পারে, মোহিনী শক্তি থাকিতে পারে, যাহাতে হেগেল কোমৎ ভুলায়, সেক্সপীয়র কালিদাস ডুবায়, আর্য্যভট্ট মোক্ষমূলর কাঁদিয়া ফিরিয়া যায় ?

কিন্তু এটা কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারিতাম না, যে ক্ষুদ্র একটা কপোলতিলকের মধ্যে সাদি হাফিজের সমস্ত মদিরা উজাড় করিয়া ঢালা থাকা একেবারেই অসম্ভব নহে; এবং কালো-চোখের নিবিড় দৃষ্টিটুকুর ভিতরে সেক্সপীয়র কালিদাসও হারাইয়া যাইতে পারে!

জীবনের এতগুলি বৎসর শুধু কাব্যলক্ষ্মীর উপাসনা করিয়াই কাটাইয়াছি, এবং কাব্যলক্ষ্মী যে স্পর্শ দিয়া বারবার তাঁহার পদ্মহস্ত ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, আজ মনে হইতেছিল, সে সবই যেন একটা দীর্ঘ নীরস তপস্যার পর অদৃশ্য দেবতার কাছে শুষ্ক পার্থিব বর লাভ!

কিন্তু চরম আনন্দ ও মুক্তি যে শুধু দেবতার দর্শন লাভের মধ্যেই লুক্কায়িত, তাহা একবারও মনে হয় নাই!

আজ সমস্ত কাব্যের ও কবিতার আনন্দ ও রস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যখন সুজাতার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল, তখন মনে হইল, এতকাল যে কাব্যলক্ষ্মীর অর্চনা করিয়াছি, সাধনা করিয়াছি, তাহার চরম সার্থকতার মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, এবং কাব্যলক্ষ্মী বুঝি তাঁহার দুর্লভ অমৃত ভাণ্ড হস্তে লইয়া ঐ সুজাতার মূর্ত্তিতেই ধরা দিতে আসিয়াছেন!

আজ সবই যেন নবীন সবুজে নন্দিত হইয়া উঠিয়াছে! অদূরের ঐ নন্দন পাহাড়, দূরের ঐ ধূসর ডিগরিয়া ত্রিকূট মাথা তুলিয়া আকাশের নির্ম্মল আলোক লেখাকে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হাসিতেছে!

নীল আকাশে খণ্ড রঙ্গিন্ মেঘের এমন খেলা, এমন লাস্যলীলা, বুঝি, সৃষ্টির শুভ প্রভাতের পর, এইই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হইয়াছে! হরিৎক্ষেত্রের মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পথগুলি, কোন্ দূর পল্লীর দিকে চলিয়া গিয়াছে! সে পথে যাহারা আসে, যাহারা যায়, তাহাদের বুকের ভিতরে যে আশা, বিস্ময়, পুলক, আনন্দ, স্ফুরিত হইতে থাকে, তাহা যেন আজ আর আমার কাছে অজ্ঞানিত ইতিহাস নহে! তাহারা যেন আমারই পুলক, আনন্দ, বিস্ময়ের এক কণা কুড়াইয়া পাইয়াছে!

দূরে কে যেন সাঁনাই বাঁশীটি বাজাইয়া বাজাইয়া আকাশ, বাতাস সঙ্গীতে সঙ্গীতে ভরিয়া দিতেছিল; কোথা হইতে মাদলের তালধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া বুকের ভিতরটা নৃত্যমুখর করিয়া তুলিতেছিল! পশ্চিমের পাগল হাওয়া খোলা জানেলার পথে পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছিল!

দূরে দূরে স্বপ্নপুরীর মতই, লাল, নীল, সাদা বাড়ীগুলি দেখা যাইতেছে; কে যেন নিপুণ হস্তে অঙ্কিত একখানি চিত্রপট মেলিয়া ধরিয়াছে। ঐ পুষ্পবিতানে ঘেরা বাড়ীগুলি আর যেন আমার কাছে শুধু-ইট্ চুণ কাঠের সমষ্টিই নহে; উহাদেরও প্রাণ আছে, হৃদয় আছে! উহারাও যেন মানুষের মতই সুখ, দুঃখ, আনন্দ অনুভব করিতে পারে! প্রভাতারুণের নির্ম্মল আলোকে উহারাও যেন পুলকিত হইয়া জাগিয়া উঠে; কোমল, শুভ্র, শশাঙ্ক লেখায় ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখে; —আবার মেঘমেদুর আনন্দবিহীন সন্ধ্যায় কাহার বিরহে ম্লান হইয়া উঠে!

কিন্তু ইহারা স্বপ্নরাজ্যের সমস্তখানি বিস্ময় ও পুলক নিঃশেষ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহারা কাহাকে চাহে,—কি চাহে? আমার কাছেই বা কি প্রয়োজন ইহাদের?

আজকার প্রভাতের আকাশ, বাতাস, চরাচর, এমন করিয়া রঙিণ নেশায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছে কেন?—

ক্ষুদ্র কক্ষটীর মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। বাহির হইয়া আসিলাম। অজিত বারান্দার উপরেই দাঁড়াইয়াছিল। দুই হাত ধরিয়া তাহাকে একবার কোলের কাছে টানিয়া আনিলাম। সে তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল!

"বেড়া'তে যাচ্ছেন্ বুঝি দাদাবাবু?—আপনি রোজই বলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন; কিন্তু রোজই ফাঁকি দেন; আজ্ আর ছাড়্‌চিনে; দিদি আমাকে আজ সকাল সকাল তুলে দিয়েচে, এবং এই বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বলেচে!—আজ্ আর আপনি আমায় না নিয়ে যেতে পার্চ্চেন্ না!"—বলিয়াই অজিত হাসিয়া উঠিল।

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলাম, "তোমাকে ফাঁকি দেবার মতলব তো আমার একটুও নেই অজিত! বেলা আট্‌টার আগে তুমি বিছানা ছাড়্‌বেনা, তা' কেমন করে আমার সঙ্গে যাবে?"

"সে বুঝি আমার দোষ?—দিদি যদি আমাকে এম্‌নি রোজ

সকালে তুলে দেয়, আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যেতে পারি। তা' সে তুলে দেয় না যে!"—অজিত তাহার ক্ষুদ্র অধর একটু প্রসারিত করিয়া, ঘাড় ফিরাইয়া একবার ঘরের দিকে চাহিল। খুব জোর দিয়া বলিলেও কথাগুলি যাহাতে তাহার দিদির কাণে না যায়, সে চেষ্টা অজিতের যথেষ্ট ছিল!

"যত দোষ হ'ল বুঝি তোমার দিদির?—তুমি যে ঘুমিয়ে থাক, ওঠ না, সেটা কিছু নয়,—কেমন?"—

"বারে, দাদাবাবুর যে কথা! আমি তো ঘুমিয়েই থাকি, উঠ্‌ব কেমন করে? ঘুমিয়ে থাকি বলেই তো উঠিনে! জেগে থেকেও উঠিনে, এমনটা হলে, না হয় আমার দোষ দিতে পার্‌তেন! দিদি তো খুব ভোরেই ওঠে;—সে যদি আমাকে না জাগিয়ে দেয়, তবে দোষটা কার?—তার না আমার? তা' দিদি জাগাবে কি, তার তো কাজের অন্ত নেই; ভোরে সবার আগে উঠেই সে ফুল তুলবে, ঘর সাজাবে, বাবার আহ্নিকের যায়গা কর্‌বে—" হঠাৎ ফিরিয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া অজিত চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল "দিদি ভাল হচ্ছে না কিন্তু, তুমি রোজই যে আমার দূরবীণ চুরি করে এনে ছাতে উঠে মজা করে সব দেখবে, তা' হচ্ছে না কিন্তু!—" অজিত বাড়ীর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল, হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিয়া ছাতের দিকে চাহিলাম; ছাতের উপর সুজাতা ছিল; অজিত যে তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া ফেলিয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতাটা করিবে সে তাহা মনে করে নাই। এখন অজিতের অতর্কিত

চীৎকার শুনিয়া অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

অজিত হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল, "কেমন জব্দ! সেদিনও ঠিক এম্‌নি জব্দ হয়েছিল বৌদির কাছে। আপনাকে বলিনি সব, দাদাবাবু! ঐ মন্দির থেকে আস্‌বার পরদিন। নন্দনপাহাড় থেকে আপনি নেমে আস্‌ছিলেন, দিদি দূরবীণ হাতে সব দেখ্‌ছিল,—আর ঠিক তেম্‌নি সময়ে বৌদি' এসে পড়লেন। ও তো দূরবীণ ফেলে দিয়ে ঠিক এম্‌নি করে ছুটে পালাল,—সে এম্‌নি ছুট, একেবারে পড়ে কি মরে!—কি জব্দ!"—অজিত আবার হাসিয়া উঠিল!

অজিত আমাকে সেদিনকার প্রত্যেকটি কথাই বলিয়াছিল বটে, এবং এমন অনেক খবরই আমি অজিতের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতাম, যাহা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছ হইলেও আমার কাছে বহু অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান্।

"কিন্তু দিদি তার অভ্যাস ত কিছুতেই ছাড়্‌বে না; সকাল বেলা দূরবীণ নিয়ে যে ছাতে উঠবে তা' উঠবেই।"

অজিতের প্রত্যেকটা কথা যেন আমার বুকের মধ্যে এক একটা ফুলের মতই ফুটিয়া ফুটিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে ছিল; নিজের কল্পনার অনুরূপ কত অর্থই মনে আসিতেছিল!

সুজাতা কবে কি করিয়াছিল, কবে কি বলিয়াছিল, অজিত অনর্গল তাহাই বকিতে বকিতে পথ চলিতেছিল। অজিত কিন্তু

বিন্দুবিসর্গও জানিত না, যে, তাহার মত বালকের প্রত্যেকটি কথাও একটা বিচিত্র স্বপ্নলোক গঠন করিয়া তুলিতে পারে!—

১১

বাসায় ফিরিয়া আসিতে বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল।

বৌদিদি কহিলেন, "বাপ্‌রে, এমন সৃষ্টি ছাড়া বেড়ানও আমি দেখিনি'; এত রোদ লাগিয়ে অসুখ করবে না?"—

বৌদিদি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং হাঁটিয়া বারান্দা পর্য্যন্ত আসিতে পারিতেন।

"ওরে সুজাতা, অজিতকে আর ঠাকুরপোকে কি তৈরী করেচিস্, এনে দে ত! আহা, ছেলেটার মুখ চোখ রাঙ্গা হয়ে গেছে! ছেলেমানুষ, ওকি পারে এই খোট্টাই রোদ্ লাগাতে!—" অজিতকে সস্নেহে কাছে টানিয়া নিয়া বৌদিদি বাতাস দিতে লাগিলেন।

"আমার কিছু কষ্ট হয় নি তো বৌদি;—আজ চোল পাহাড়ে গিয়েছিলাম,—সে কি পাহাড়,—আমি ভেবে ছিলাম, যেন কতই উঁচু হবে;—তা' বৌদি, সে কি পাহাড়, তুমি যে গোবর্দ্ধন পাহাড়ের কথা বলে থাক, তেম্‌নি হবে। একটু বেশী গায়ে জোর থাকলে বোধ হয় তুলে হাতের উপর রাখা যায়।—অমন পাহাড় জান্‌লে আমি কখ্‌খনই দেখ্‌তে যেতাম না! তা' ওর চেয়ে আমাদের নন্দন পাহাড়ই ভাল; দাদাবাবু তো ছাড়্‌বে না"—অজিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ওরে পাগল, বাঙ্গ্‌লার মাটীতে একটা ঢিবিও দেখিস্‌নি,—তবু ও ওটা তোর গায়ে লাগ্‌ল না; আচ্ছা; তোকে একদিন

ত্রিকূট পাহাড়ে নিয়ে যাব; গাড়ী করে যাওয়া যাবে;—বৌদি', তুমি একটু শক্ত হয়ে উঠ্‌লেই যাব,"—

"সুজাতাকে বুঝি নিয়ে যাবে না, ঠাকুরপো?"—বৌদিদির একটু হাসি পালকের জন্য উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অজিত বলিয়া উঠিল, "না, দিদিকে আর নিয়ে কাজ নেই; ও মন্দিরে ঢুক্‌তেই মূর্চ্ছা যায়, ত্রিকুট পাহাড়ের নীচে হয়তো ওকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।"—

সুজাতা খাবার নিয়া আসিতেছিল, অজিতের কথাগুলি শুনিয়া তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তারপর একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে অজিতের মুখের দিকে চাহিল।

"ও সব আমি ভয় করিনে,—তুমি বাপু যে মেয়ে, তার পরিচয় সেদিনই পাওয়া গেছে! ভালকথা, বৌদি, চোল্ পাহাড় থেকে একটা নতুন জিনিষ এনেছি,"—কথা শেষ না করিয়াই অজিত ছুটিয়া বাহিরের বারান্দায় গেল; এবং প্রকাণ্ড একটা পুঁটুলি দুই হাতে টানিয়া আনিয়া বৌদিদির পায়ের কাছে ধুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল!

—"কিরে, ও?"—

"এগুলি দিয়ে মোরব্বা তৈরী করে দেবে কিন্তু, বৌদি," পুঁটুলি খুলিয়া অজিত তাহার উড়ানীখানা টানিয়া লইল; একরাশি বেল সমস্ত ঘরে গড়াইতে লাগিল।

"ওরে পাগল, তুই গোবর্দ্ধন ধারণ না করতে পারলেও গন্ধমাদন যে ভেঙে আন্‌তে পারিস্, তা'তে আর কোনও সন্দেহই নেই!"—

বৌদিদির কথাটার অর্থ গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া অজিত কহিল, "সে এত বেল গাছ পাহাড়ের উপর হয়ে রয়েচে, বৌদি, তোমাকে আর কি বল্‌ব! কিন্তু বেলগুলি সবই ভারি ছোট ছোট; গাছগুলি খুব নীচু, হাত বাড়িয়ে বেল পাওয়া যায়!"—

চাকরটাকে ডাকিয়া বৌদিদি কহিলেন, "ওরে বেলগুলি কুড়িয়ে ঐ চুব্‌ড়িটাতে রাখ্‌তো!—সুজাতা খাবার রেখে পালিয়েচে! তোমরা খেয়ে নাও, এর পর আর কত বেলায় ভাত খাবে?"—

খাবার খাইতে খাইতে অজিত কহিল,—"বৌদি, আজ আমরা আরও একটা নতুন যায়গায় গিয়েছিলাম"—

—"কোথায় রে?"

"ওই বম্পাস্‌ টাউনে, সেই ভদ্রলোকদের বাসায়; যিনি মন্দিরে সেদিন দাদাবাবুকে কত সাহায্য করে ছিলেন"—

—"সত্যি নাকি?"—

"হু,—তাঁরা আজ বিকেলে এখানে আস্‌বেন যে!"

—"তাঁরা!—কে কে আস্‌বেন রে?"

আমি হাসিয়া কহিলাম,—"সে বাসার সবাই-ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বেন;—মেয়েরাও নাকি আস্‌বেন, অতুলবাবু বল্‌লেন,"—

"ওমা, তাই নাকি? তবে তো কিছু খাবার তৈরী করিয়ে রাখ্‌তে হয়;—ও সুজাতা, সুজাতা!"—

মুখের ভিতরে খানিকটা খাবার গুঁজিয়া দিতে দিতে অস্পষ্টস্বরে পেটুক অজিত কহিল, "কি কি তৈরী করবে বৌদি' ? তোমার সেই রসপুলিটা কিন্তু ভুলোনা !"—

"ওরে পেটুক ছেলে, তুমি কতটা রসপুলি খেতে পার, তা' আমি একদিন দেখব !"—

অজিতের মুখের খাবার ফুরাইয়াছিল, সে উৎসাহপূর্ণ মিনতির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একদিন আর কেন ? আজই দেখ না, বৌদি' ! আজকার দিনটাও খুব ভাল দিন।—আমি পাঁজিতে দেখেছি "অলাবু ভক্ষণ" নিষেধ, কিন্তু রসপুলি ভক্ষণ নিষেধ লেখেনি তো !—আচ্ছা, দাদাবাবু, "অলাবু"টা কি ?"—

অজিত তাহার এম্, এ, পাশ দিগ্গজ দাদাবাবুকে যে কথাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, তাহার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কোনও কেতাবের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা, একবার মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিলাম ; কিন্তু বিস্তর লাটীন্, জার্ম্মাণ শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাইলেও, "অলাবু"র অর্থ তো কোথায়ও পাইলাম না।

বৌদিদি কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ সুশ্রীতা সেখানে ছিল না।

কাহারও পরিবর্ত্তে একদিনের জন্য কোনও স্কুলে নূতন শিক্ষকতা করিতে গেলে প্রথমদিন দুষ্ট ছেলের হাতে পড়িয়া যেমন শিক্ষক বেচারাকে একেবারে নাকাল হইয়া উঠিতে হয়, আমারও অবস্থাটা কতকটা তেমনি হইয়া উঠিল।

বৌদিদির নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না; একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওরে অজিত, ওসব এম্, এ, পাশের বিদ্যের কুলাবে না। তুই তোর দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করিস্, সে বলবে।"—

আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধহয় অজিতের দয়া হইল, সে চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "যে কথার অর্থ এম্, এ, পাশের বিদ্যের কুলোবেনা, তা আমি জানতে যাব বুঝি দিদির কাছে? তুমি তো খুব বল্লে, বৌদিদি!"—অজিত হাসিতে লাগিল।

রেকাবীতে একটা ক্ষীরের সন্দেশ ছিল, ভারি খুসি হইয়া তাহা অজিতের রেকাবীতে তুলিয়া দিয়া কহিলাম, "ঠিক কথা অজিত। তোর এম্, এ, পাশ করতে কোনোদিনই "অলাবু"র অর্থ দরকার হবে না, এবং তুই স্বচ্ছন্দে পাশ করে যেতে পারবি। —এই আমি তোকে বর দিলুম।"—

সন্দেশটা মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "আচ্ছা, বৌদি' তোমার 'অলাবুর' চেয়ে, এই ক্ষীরের সন্দেশ রসপুলি অনেক ভাল নয় কি?"—

"অলাবু জিনিষটা কি তাই জান্‌লিনে, তার ভাল কি মন্দ কেমন করে বুঝ্‌বি?"—

"আরে "ভক্ষণ নিষেধ" লিখেচে, তবু পাঁজির পাতা কেউ ছিঁড়ে ফেলেনি, তা'তেই বুঝি, ওর চেয়ে এগুলি ভাল। আর দেখেচ তুমি, দুধ দিয়ে তৈরী কোনও খাবার, পাঁজিতে 'ভক্ষণ নিষেধ' লিখেচে! আরে পাঁজি যে তৈরী করে তারও তো কোন্ খাবারটা ভাল, কোনটা মন্দ তা' জ্ঞান আছে! মনে কর, কেউ

যদি "ক্ষীরের সন্দেশ ভক্ষণ নিষেধের" দিনে একতাল ক্ষীরের সন্দেশ হাতে দিয়ে বসে তা' হ'লে সে বেচারা কি করবে বল দেখি ?"—

কথা বলিতে বলিতে অজিত তাহার খাবারের শূন্য রেকাবীর উপর আর একবার হাত বুলাইয়া লইল, কিছু হাতে ঠেকে কি না !

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "সবাইতো আর তোর মত পেটুক নয়রে, অজিত ! তা' তোকে আর দুটো মিষ্টি দেব ?"—

লুব্ধ অজিত কহিল, "ভোজনের আর ওজন কি বৌদি' ?—দিয়ে যদি তুমি খুসি হও, আমি কেন আপত্তি করে তোমার মনে কষ্ট দেব, তাই বল ।"—

অজিতের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল ।

এই লোভী ছেলেটা অল্পদিনের মধ্যেই বৌদিদির প্রচুর স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল । চিরদিনই বৌদিদির কাছে পেটুকের আদর যথেষ্ট ! অজিত সময়ে অসময়ে নানা আবদার করিয়া বৌদিদির সমস্ত স্নেহটুকু, আদরটুকু অধিকার করিয়া লইতেছিল ।

এই সন্তানহীনা নারীর ক্ষুধিত অন্তর একটা ছোট ছেলেকে বুকের কাছে রাখিয়া লালন করিবার জন্যই যে একান্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম ।

বিকালের দিকে অতুলবাবুদের গাড়ী ফটকের কাছে আসিয়া থামিতেই অজিত ছুটিয়া যাইয়া গেট্ খুলিয়া দিল । অজিতের

সঙ্গে অতুলের স্ত্রী ও সুজাতার সমবয়স্কা একটী কিশোরী ভিতরে আসিলেন। এতক্ষণ প্রাঙ্গনের এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম; এখন অগ্রসর হইয়া অতুল বাবুদের কাছে গেলাম। অতুলবাবুর সঙ্গে আর একটী যুবক ছিলেন।

নমস্কার প্রত্যর্পণ করিয়া হাসিমুখে অতুলবাবু কহিলেন, "এটী আমার ছোট ভাই অনিল; আস্‌ছেবার এম্, এ, দেবে"—

আমি অনিলকে নমস্কার করিয়া কহিলাম, "উনি যে আপনার ছোট ভাই, তা' বল্‌বার আগেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম; আপনাদের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশী রয়েচে যে,—"

কথা বলিতে বলিতে বারান্দার সিঁড়ির উপরে উঠিতেছিলাম; হঠাৎ চাহিয়া দেখিলাম, দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া বৌদিদি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভিতরেও মেয়েদের চাপা হাসির শব্দ শুনা যাইতেছিল!

বিস্মিত দৃষ্টিতে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আ আমার কপাল, এই তোমার অতুলবাবু!—আমার তখনি মনে মনে সন্দেহ হয়েছিল; তা' কেমন করে বুঝ্‌ব যে ওরা এখানে এসেচে!"—

অতুল ও অনিল বৌদিদির কথা শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, এবং দুই লাফে সিড়ি পার হইয়া বারান্দার উপর উঠিল! বিস্মিতকণ্ঠে অতুল কহিল, "সে কি, ইন্দিরা দিদি, তুমি এখানে?"—

অতুল ও অনিল উভয়েই বৌদিদিকে প্রণাম করিল। তিনি

অনিলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ও কি অতুল, তুই যে আমাকে প্রণাম কর্‌লি? ছেলেবেলায় মার সঙ্গে যখন মামাবাড়ী যেতাম্, তখন বিজয়ার দিনও তো তোর কাছ থেকে একটা প্রণাম আদায় কর্ত্তে পারি নি'! বয়সে সাত দিনের বড় বলে আমি তোর কাছ থেকে গুরুজনের সম্মান যতই আদায় করে নিতে চাইতাম, তুই ততই বেঁকে বস্‌তি—মনে আছে সে কথা? দিদি বলেও তো কোন দিন ডাক্‌তে চাইতি না।"—

—"ছেলে বেলায় কি গোঁয়ার ছিলাম, তা' বুঝি তুমি ভুলে যাওনি ইন্দিরা দি'?"—

বৌদিদি হাসিয়া কহিলেন, "ভাখ্, আমার এই ছেলের মত দেবরের সাম্‌নে আমার নামটা আর নিস্‌নে। তুই তো এখন বড় সড় হয়েছিস্, আমিই না হয় সাতদিনের দাবী ছেড়ে দিয়ে তোকেই অতুলদা' বলে ডাক্‌ব!"—

তারপর তেমনি হাসিমুখে আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি তো অবাক্ হয়ে গেছ, ঠাকুর পো! এরা যে আমার মামাত ভাইরা!—ওমা, ওরা এতদিন এখানে রয়েচে, তা' ঘুণাক্ষরেও জানিনি!—কিন্তু তোমাদের ইংরিজি আদব কায়দা এমনি করে হাত পা বেঁধে দেয়, যে, একটু ভাল করে পরিচয়টা নেবে তারও ক্ষমতা থাকে না। তাই ও নিয়মে না চলে, আমাদের দেশী নিয়ম মেনে চল্‌লেই হয়;—পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাত পুরুষের খবর টের পাওয়া যায়!"

"তা' বল্‌তে পার বৌদি', ও কেমনই আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, বেশী পরিচয় নেওয়াটা আর ঘটেই ওঠে না।"

অনিল ধীরে ধীরে কহিল, "অনেক দিনের একটা কথা মনে হচ্ছে, ইন্দিরা দিদি!—কলেজে আমাদের সঙ্গে হীরালাল বলে একটী ছেলে পড়্‌ত; ক্লাসে রাজেন্‌ বলে আর একটী ছেলের সঙ্গে তার খুব খাতির হয়। প্রায় ছ'মাস পরে একদিন মেসের ঘরে হীরালাল মুখ ভার করে বসে রয়েচে দেখ্‌লাম। বোধ হয় কাঁদ্‌ছিল;—অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জান্‌লাম, ঐ রাজেন্‌ হীরালালের বৈমাত্রেয় ছোট ভাই, এবং এতদিন পরে বাড়ীঘরের খোঁজ নিতে যেয়ে সব বেরিয়ে পড়েচে;—তাই হীরালাল কাঁদ্‌ছিল!"—

"কুলীন বামুনের ছেলে বুঝি?"—

"হাঁ, তাই-ই—গোড়াতেই যদি বাপের নাম জিজ্ঞাসা কর্‌ত তা' হলে এমনটা হতে পার্‌ত না,"—

সকলেই খুব খানিকটা হাসিয়া লইল।

"আমি ত আগে কিছু বুঝিনি;—বৌ ঘরে এল, তাকে দেখেই আমার মনে হ'ল এর মুখ আমার জানা; কিন্তু সেই তোর বিয়ের পর তিন চার দিন ছাড়া তো ওকে আর দেখিনি, চার পাঁচ বছরে চেহারাও অনেকটা বদ্‌লে যায়,—বিশেষ মেয়েদের চেহারা;—কিন্তু, ওর ডা'ন্‌ গালের ছোট্ট তিলটা দেখে, আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা'ও দূর হ'ল। তখন আরও নিঃসন্দেহ হব বলে দোরের পাশে এসে দাঁড়ালাম!—ওমা দেখি, আমারি শ্রীমান্‌ ভাইরা!"—

অজিত একটু এদিক ওদিক চাহিল, তারপর বৌদিদির

একেবারে কোলের কাছে সরিয়া গিয়া কহিল, "তোমার যে শ্রীমান্ ভাইদের বাজার বসে গেল, বৌদি' !"——

—"এবং তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী শ্রীমান্, আমার এই ছোট্ট অজিত ভাইটি !"—অজিতকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বৌদিদি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

কিন্তু অজিত একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রবল আপত্তি জানাইয়া কহিল, "বারে, আমি বুঝি হ'লাম ছোট্ট অজিত !—সেদিন সায়েবের বাসায় গেছ্লাম, সায়েব আমার হাত ধরে খুব নেড়ে দিয়ে বল্লে, 'বাঃ, অজিত, তুমি এ দু'মাসে খুব বড় হয়ে উঠেছ যে !'—সত্যি বৌদি, যখন প্রথম দেওবরে আসি, তার চেয়ে আমি ডবল বড় হয়ে উঠেছি কি না, আচ্ছা বলনা কেন ?"—অজিত তাহার পাঞ্জাবীর আস্তিন্ টানিয়া সুপুষ্ট হাতটা বৌদিদির দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বৌদিদি আর একবার অজিতের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন, "ষাট্ আমার বাছা, শরীর ভাল হয়েছে কইরে তোর অজিত ? ক'দিন অসুখ হয়নি, এই যা।"—

—"পারলেনা বুঝি প্রাণ ধরিয়ে বল্তে ? সেদিন মেমসায়েবের ছোট মেয়েটাকে টেনে কোলে নিতে গেছ্লাম, মেমসায়েব হেসে বল্লে, ওকে তুমি কোলে তুল্তে পারবে না, অজিত, ও বড্ড ভারি আছে !"—

অজিতকে থামাইয়া দিবার জন্য বৌদিদি কহিলেন, "তোর মেমসায়েবের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিতে পারিস্, অজিত ?

তা'হলে তার বড় মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধটা স্থির করে ফেল্‌তাম।"—

সেখানে যে আরও কয়েকজন নবাগত ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন. সে কথাটা মনে করাইয়া দিবার জন্য অজিত একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া দ্রুত ইঙ্গিত করিল; তারপর ব্যস্তকণ্ঠে কহিল,—"মেমসাহেব তো তোমার কথা খুব জিজ্ঞেস্ করেন, বৌদি'!—হয়তো এখানে একদিন এসে তোমাদের দেখেও যেতে পারেন;—বল্‌ছিলেনও একদিন তাই!"

—"না বলে কয়ে বুঝি হঠাৎ তাঁদের নিয়ে আসিস্‌রে অজিত!"—

"তুমিও যেমন বৌদদি, মেম এল আর কি তোমার বাসায়,—"

"সত্যি দাদাবাবু, হয়তো মেম্ একদিন আস্‌বেন, নন্দন-পাহাড় দেখ্‌তে তো একদিন আস্‌বেনই; সেদিন যদি আমরা অনুরোধ করি অবিশ্যি এখানে একবারটী আস্‌বেন।"

অনিল কহিল, "তা' অসম্ভব কিছু নয়; এঁরা আইরিস্‌ম্যান্; নূতন এখানে এসেচেন, বাঙ্গালীদের সঙ্গে একটু মেলামেশার ইচ্ছাও আছে। বেশ ভাল লোক, সবাই তো বলে। তা' অজিতের সঙ্গে এত খাতির হ'ল কি ক'রে?"

তখন বৌদিদি অজিতের সঙ্গে সাহেবের কেমন করিয়া পরিচয় হইল, সবটা খুলিয়া বলিলেন।

"সাহেবের বাড়ীতে ও রোজই একবার যে যাবে তার বাধা নাই। মেম সাহেবের একটি ভাই আছে, ওরি এক বয়সী; তার

সঙ্গে পাল্লাবধা, ঘুষাঘুষি করা, ওর নিত্যিকার কাজ; ভারি সুন্দর ছেলেটা. কতদিন এ বাসায় এসেছে; খাবার কিছু দিলে খেতেও আপত্তি করে না।"

"বৌদিদি এন্‌লার্ট কাল আমার কাছে কি বলেছে জান?"

"কি রে, অজি?"—বৌদিদি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সে যে নিষেধ করে দিয়েচে, বৌদি'! একদিন সে নিজেই বল্‌বে বলেচে।"—

"তবুও তোর কাছে শুনিই না, কি এমন কথাটা!"

অজিত তখন বৌদিদির কাণের কাছে মুখ নিয়া গোপনে যে কথাটি বলিল, তাহা আমরা প্রত্যেকেই শুনিতে পাইলাম।

"এই রে, গেল বৌদিদির আর একটা ভাই বেড়ে! এতগুলি ভাইয়ের অবদার অত্যাচার একা সহ্য করে উঠ্‌তে পার্‌লে হয়!"

চাহিয়া দেখিলাম, বৌদিদির চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু একটা প্রসন্ন তৃপ্তি সমস্ত মুখখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "যিনি দেওয়ার মালিক, তিনি দুই হাতেই ঢেলে দেন,—এতটুকুও কৃপণতা করেন না ত! কিন্তু বুদ্ধির দোষে আমরাই সব নষ্ট করে ফেলি যে! ভাই পাওয়ার চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে, ঠাকুরপো? যে বোনের এতগুলি ভাই পাওয়ার সৌভাগ্য হয়, সে ত সীতাদেবীর মতই ভাগ্যবতী, তবু তিনি যে—শুধু এক লক্ষ্মণকেই পেয়েছিলেন।"

আমরা কেহই যে লক্ষ্মণ ঠাকুরের পায়ের ধূলার উপযুক্তও নই, সে কথাটা বৌদিদিকে বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল।

দুই একজন মানুষের মুখের চেহারার ভিতরে মাঝে মাঝে, এমন একটা কিছু ফুটিয়া উঠে, যাহাতে, তর্ক প্রতিবাদ যাহারা করিতে চাহে, তাহাদের একেবারে নির্ব্বাক্ করিয়া দেয়।

আমিও বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া কোনও কথা বলিতে পারিলাম না।

মনে হইল, এই অত্যন্ত স্নেহশালিনী নারীর ভাণ্ডার উজাড় করিয়া শুধু স্নেহের দাবী করাই চলে; কোনও তর্ক প্রতিবাদ করা যেন একেবারেই চলে না!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি কহিলেন, "ভাল কথা অতুল, বিদ্যুতের বিয়ের কি কর্‌চিস্‌রে? ও তো বেশ্ বড় হয়ে উঠেছে যে।"

"কই, কিছু তো করে উঠ্‌তে পারি নি; আজ কালকার দিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ব্যাপার, তা'ত জান ইন্দিরা দি'!"—

"সত্যি অতুল, আমি অনেক সময়েই ভাবি যে পোড়া দেশে এ কি প্রথাই ঢুকেছে। এমন সব মেয়ে, যাদের বিয়ের জন্যে সেকালে কর্ত্তাদের এতটুকুও ভাব্‌তে হত না, আজ নাকি দেশটা শিক্ষা পেয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, তবুও এই সব লক্ষ্মীর মত মেয়েদের বর জোটানো কত বড়ই দায় হয়ে উঠেছে। শুধু টাকার জোরে কত মেকি চলে যাচ্ছে। কিন্তু খাঁটি সোণা বাচাই করে

ক'জন নিতে চায়?"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৌদিদি অনিলও আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "এই ইংরিজি শেখার সব চেয়ে বড় দোষই হয়েচে, এই, যে, প্রত্যেক মানুষ নিজেকেই বড় করে দেখ্‌তে চায়, কিন্তু নিজেকে বড় করে দেখ্‌তে গেলেই যে সব চেয়ে আগে নিজের স্বার্থটাই বড় হ'য়ে ওঠে, সেটা হিসাব করে দেখ্‌তে কেউ চায় না!

"ঠিক্ কথা বৌদিদি—কৌলীন্যের জন্য কিছু মর্য্যাদা কর্ত্তারা সেকালে নিতেন বটে; কিন্তু সে দাবীটা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যেত; কার কাছে কি প্রাপ্য হবে, সেটা ঠিক্ হিসাব করে ধরে দেওয়া ছিল; কেউ তা ছাড়িয়ে যেতেও চাইত না,—চাইলেও সমাজ তা' সহ্য করত না। এখন তো আর তা' কিছু নেই, এখন শুধু স্বার্থের দিক্ দিয়েই হিসাবটা তৈরী হয়ে উঠ্‌চে, কাজেই এ সব স্বার্থের দাবী বেড়েই চল্‌বে!"—

অনিল কহিল, "হাঁ, বাড়বেই বটে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। নূন জলের ভিতর ফেল্‌লে গলেই থাকে; কিন্তু এমন একটা সময় আছে, যখন ক্রমাগতই ফেল্‌তে ফেল্‌তে নূনও আর গলে না! সমাজের যখন সেই অবস্থা দাঁড়াবে তখন এ সব বন্ধ হয়ে আস্‌বে।

অতুল কহিল, "সে অবস্থা আস্‌বার এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলে মনে হয়;"—

বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "খুব বেশী বিলম্ব আছে বলে মনে হয় না। আট বছরে গৌরীদান এখন আর হয় না।

এখন এই সব গৌরীদের ষোল সতের বছরের আগে আর দান করা ঘটে উঠ্‌ছে কই ?"

অনিল কহিল, "এর পর মেয়েরা যখন এই অপমানটাকে বেশ্ অনুভব কর্ত্তে শিখ্‌বে, তখন তা'রা যা'তে অপমান থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে তা'রি উপায় খুঁজবে !"—

—"এই তোমার স্নেহলতার মত ?"—অতুলের কথা শুনিয়া অনিল একটু সোজা হইয়া বসিল। তারপর বৌদিদির মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "না, স্নেহলতার ব্যাপারটা আমি কোনদিনই ভাল বলে মনে করি না,'—তবে কোন্ উপায়ে মেয়েরা নিজেদের সম্মান বজায় রাখবে, তা' তারা নিজেরাই ঠিক্ করে নিতে পারবে।"—

এতক্ষণ বৌদিদি শূন্যদৃষ্টিতে নন্দনপাহাড়ের দিকে চাহিয়া-ছিলেন। এখন অজিতের মাথাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "ঠাকুরমাদের কাছ থেকে বাঙ্গলার মেয়েরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পুড়ে মরবার শক্তি বোধ হয় কিছু কিছু পেয়েছিল, কিন্তু তাঁর অপব্যবহার ঐ স্নেহলতা যেমন করেছে, এমন আর একালে কেউ করেছে বলে শুনিনি !—ও তো মরেছেই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার মেয়েগুলিকে অমন কলঙ্কর মরবার পথটা দেখিয়ে দিয়ে সভ্য-জগতের কাছে অত্যন্ত ছোট করে দিয়ে গেছে। 'ওটা যে মোটেই ভাল হয়নি, তা' প্রমাণ হয়ে গেছে—' বাঙ্গালীর ঘরের হতভাগীদের মরবার এই অন্যায় নেশা দেখে।"—

অতুল কহিল, "আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটা যে, এতটা

ছড়িয়ে পড়েচে, তার জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী ঐ সংস্কারক-তারারা; হিন্দু-সমাজকে একটা গ্লানি দেবার জন্তেই এটাকে তাঁরা সে সময়ে ভারি উঁচু করে ধরেছিলেন। মরবার পরও অতটা বাহবা পাওয়ার মধ্যে একটা মস্ত প্রলোভন লুকিয়ে আছে। আমি জানি একটি ভদ্রঘরের বধূ স্নেহলতার ব্যাপারের পর কেরোসিনে পুড়ে মরেছিল; কিন্তু সে যে চিঠিখানা রেখে গিয়েছিল, তার মধ্যে পুনশ্চ দিয়ে অনুরোধ করা ছিল যে, ঐ চিঠিখানাকে যেন খবরের কাগজে ছেপে দেওয়া হয়! তার দুঃখ-কষ্টের যথেষ্ট কারণ ছিল, জানতাম, সে জন্ত তার পুড়ে মরার খবর পেয়ে, সমস্ত অন্তরটা তার' জন্ত ব্যথায়, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণও হয়ে উঠেছিল; কিন্তু ঐ চিঠিটা পড়েই আমার হরিভক্তি চটে গেল।—খোঁজ করে দেখ, এরা যে মরে, তার পোণে ষোল আনাই একটা কল্পিত দুঃখ গড়ে নিয়ে পোষণ কর্ত্তে থাকে বলে, তারপর একদিন নভেলীয়ানার চূড়ান্ত করে দেয়!"—

"দাদার সমালোচনার মধ্যে মায়া দয়া একটুও নেই;—সবাই কি নভেলীয়ানা করে? মরবার যথেষ্ট কারণও থাকতে পারে ত—"

অনিলের কথা শুনিয়া অতুল কহিল, "আত্মহত্যা করবার আবার কারণ?—তুই যে অবাক্ করলি, অনিল! ও যারা করে, কাপুরুষ বলেই করে।—" "পৃথিবীতে অনেক বড় লোক আত্ম-হত্যা করেছে দেখা যায়,—"

"তাদের আমি বড়লোক বলিনে; যারা ইহকাল সর্ব্বস্ব,

পরকাল মানে না, ভগবান্‌কে উড়িয়ে দেয়, তারাই ও কর্‌তে পারে !

"নেপোলিয়ঁা পৃথিবীর খুব একটা বড়লোক ছিলেন, মান্‌বে ত ?—আত্মহত্যা কর্‌বার তাঁর যেমন যথেষ্ট কারণ হয়েছিল, অমন কটা লোকের হয় ? তবু তিনি আত্মহত্যা করেননি ! ন্যারেঙ্গো, অষ্টার্লিজে তাঁর যে বীরত্ব ফুটে না উঠেছিল, তা' ফুটে-ছিল তাঁর ঐ আত্মহত্যা না করায় ; তিনি যদি আত্মহত্যা কর্ত্তেন তা' হলে তাঁর জীবনব্যাপী সমস্ত বীরত্বের উপরেই কলঙ্ক কালিমা লেপন করে দিয়ে যেতেন ।

বৌদিদি একটু হাসিয়া বাধা দিয়া—কহিলেন, "ওরে তোরা দু'ভাই এখনো তেম্‌নি তার্কিক আছিস্ যে ! তর্ক কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে ত জ্ঞান থাক্‌ত না ; সেই কত বছর আগেও ঠিক এম্‌নিটী ছিলি !"

পিসিমা এতক্ষণ ভিতরে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, এখন বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "ও বৌমা, তোমাদের কথা যে আর ফুরায়ই না। ওদের কিছু খেতে দেবে না ?"

বৌদিদি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কতদিন পরে ভাইদের পেয়েছি পিসিমা, তাই আর সব ভুলে গেছি ।"—

অতুল ও অনিল পিসিমাকে প্রণাম করিল। পিসিমা তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন, "চিরজীবী হও,—সুখী হও।"

বৌদিদি কহিলেন, "এর নাম অতুল, ও আমার সাত দিনের

ছোট,—ও হাইকোর্টে ওকালতী করে; আর এটী ছোট অনিল, এম্, এ, দেবে!"

"আচ্ছা, বাপ্ নেই, কেইবা বাছাদের সুখ দেখে, ভাল হয়েছে শুনে আহ্লাদ করে! তা' আশীর্ব্বাদ করি মার কোল জুড়িয়ে থাক, কোনো দিন দুঃখ কষ্ট পেও না,"—

অতুল ও অনিল পিসিমাকে আর একবার প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে অতুলরা চলিয়া গেল। চলন্ত গাড়ী হইতেও মুখ বাহির করিয়া অতুল ও অনিল তাহাদের বাসায় কবে যাইব সে তারিখটা বার বার মনে করাইয়া দিতে লাগিল।

গাড়ীতে উঠিবার সময়ে এবং গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া যখন কথা বলিতেছিলাম তখন বিদ্যুৎকে দেখিলাম।

এই বিদ্যুৎ!—হাঁ, সুন্দরী বটে! এমন সুন্দরী যে কোনও স্ত্রীলোক হইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। এমন তীব্র সৌন্দর্য্য আমি আর দেখি নাই।

তীক্ষ্ণধার তরবারির মতই শাণিত এই উজ্জ্বল রূপের উপর চক্ষু পড়িলেই দৃষ্টি ঝল্সিয়া ফিরিয়া আইসে!

গাড়ী চলিয়া যাইতেই বাসার দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সিঁড়ির উপর সুজাতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল। গাড়ীর জানেলা দিয়া একখানি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত হাস্যোজ্জ্বল মুখের পাশে আর একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ দেখা যাইতেছিল।

সে মুখ বিদ্যুতের; দীপ্ত শিখার মতই উজ্জ্বল!—ফিরিয়া সুজাতার দিকে চাহিলাম।

মনে হইল, শরতের নির্ম্মল, কোমল জ্যোৎস্না মূর্ত্ত হইয়া সিঁড়ির উপর নামিয়া আসিয়াছে! দেখিলে চক্ষু তৃপ্ত হয়; ঝল্‌সিয়া যায় না!

আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুজাতা তাহার নিবিড় মেঘতুল্য চুলের রাশি দুলাইয়া মৃদু হাস্যোজ্জ্বল মুখে দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল!—

১২

সেদিন দুপুরের কিছু পরেই বেশ্ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল!

আরব্যোপন্যাসের বিখ্যাত কলসীটার ঢাক্‌নি খোলা পাইয়া আবদ্ধ দৈত্যরাজ যেমন প্রথমেই কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশির মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, ডিগ্‌রিয়া, নন্দন-পাহাড়ের উপরেও, বৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে নিবিড় মেঘরাশি তেমনি কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। আরব্যোপন্যাসের দৈত্যটা ডিগিরিয়া, নন্দনের উপর ঠিক্ মূর্ত্ত হইয়া না দেখা দিলেও, মনে হইতেছিল, কিছু বেশীক্ষন সেই দিকে তাকাইয়া থাকিলেই, বিপুলকায় দৈত্যটা পুঞ্জীভূত মেঘের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিবে!

বর্ষণক্লান্ত মেঘের আড়াল দিয়া খানিকটা সূর্য্যালোক বাহির হইয়া আসিয়া, নির্ম্মল, সুধৌত বৃক্ষগুলির শীর্ষে শীর্ষে পড়িয়া হাসিয়া উঠিল! দূরের রঙ্গিণ বাড়ীগুলি সূর্য্যালোকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়া

একখানি প্রকাণ্ড সবুজ মখ্‌মলের উপর সাজান নানারঙের চুনী পান্নার মতই সুন্দর, উজ্জ্বল দেখাইতেছিল!

এ দৃশ্য এতই সুন্দর, যে বৌদিদিকে ডাকিয়া দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তাঁহার ঘরের কাছে আসিয়া ডাকিলাম, "বৌদি",—

জানেলার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া বৌদিদি—একটু হাসিয়া কহিলেন, "এই যে, আমি এখানে রয়েছি;—দেখেছ, ঠাকুর পো, বাইরে 'একশ মাণিক' জ্ব'লে' উঠেচে? সুজাতা তো আমাকে সেলাইটা সারতেই—দিল না; এ উঠে দেখতেই হবে!"—

সুজাতা একটু সরিয়া জানেলার কবাটের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার লজ্জারক্ত মুখের উপর একবার চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া, বৌদিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিলাম।

"ওকি হাস্‌লে যে?"—

—"একজন বিখ্যাত কবি বলেছিলেন, 'মানুষের অন্তরে ঠিক একই সুর সাজে'!"—

—"অর্থাৎ?"—

"আমিও তোমাকে ঠিক্ বাইরের ঐ সৌন্দর্য্যটা দেখ্‌বার জন্যই ডাক্‌তে এসেছিলাম।"—কথাটা ব'লিয়া ফেলিয়াই বুঝিলাম বৌ-দিদির হাতে আর পরিত্রাণ নাই;—এবং এখনই যে আমার উপর একটা তীক্ষ্ণ বাণ সুভদ্রার মতই অব্যর্থ লক্ষ্যে বৌদিদি নিক্ষেপ করিবেন, তাহা প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত কোনও অস্ত্র হাতের কাছে পাই কিনা, ব্যস্ত হইয়া খুঁজিতে লাগিলাম।

প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে অস্ত্রের অত্যন্ত নিষ্ঠুর জ্যোতিঃ যেমন একবার মুহূর্ত্তের জন্য ঝলসিয়া উঠে—তেমনি বৌদিদির সমস্ত মুখখানি একবার হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তার পরই সুজাতার দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"শুন্‌লিরে সুজাতা, মানুষের অন্তর ঠিক্ একই সুরে বাজে!—হাজার মাইল দূরের তারহীন খবরের যন্ত্রগুলি যদি একই সুরে বাজ্‌তে পারে, তা'হলে দেওয়ালের এ পাশ ও পাশের দুটো মানুষের অন্তর একসুরে বাজ্‌বে, সে আর বেশী কথা কি? কবি কিছু বেশী বলেন্‌নি তো, ঠাকুর পো! এ আমি যে মোটেই কবি নই, আমিও বল্‌তে পার্‌তাম!—কি বলিস্‌রে সুজাতা?"—

আর সুজাতা! সুজাতা অত্যন্ত নুইয়া পড়িয়া, শাড়ীর প্রান্ত ভাগের সূতা টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া আঙ্গুলে জড়াইতেছিল!

"বাঃ! আমি বুঝি তাই বল্‌লুম! আমি সাধারণ ভাবে সকল মানুষের কথাই বলেছি!"—

"সকল মানুষের ভিতর থেকে দুটো মানুষ তো বাদ্ যায় না! —যায় কি?—আচ্ছা কি বলিস্ তুই সুজাতা?"

"ফাঁক পেলে মেয়েমানুষ নিজের পেটের মেয়েকেও ঠাট্টা কর্ত্তে ছাড়ে না, একথাটা এতদিন তেমন বিশ্বাস করি নি।—ওটা তা'হলে ঠিক দেখ্‌চি, বৌদি'!"—

কিন্তু বৌদিদি যে মোটেই হটিবার পাত্রী নহেন, তাহা আর কেহ না জানিলেও, আমি বেশ জানিতাম্। তাই যথাসম্ভব গম্ভীর মুখে বৌদিদি যখন কহিলেন, "ছিঃ ভাই, ও সব শাস্ত্রের

কথা। ওসব অবিশ্বাসও কর্ত্তে নেই, ও নিয়ে বেশী আলোচনাও কর্ত্তে নেই! তা' তোমরা তো ইংরাজি পড়ে কিছুই মান্‌তে চাও না;—সেই যে মহাদোষ!" তখন আমি একেবারেই বিস্মিত হইলাম না।

কিন্তু বিপক্ষকে নিজের পরিত্যক্ত অস্ত্র লুফিয়া লইয়া ফিরাইয়া প্রয়োগ করিতে দেখিলে আক্রমণকারী সৈনিক যেমন নিস্ফল আক্রোশে অস্থির হইয়া উঠে, আমার অবস্থাটাও কতকটা তেমনি হইয়া উঠিল!

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছোট টেবিলটার কাছে গেলাম; ডিবায় পান ছিল, দুটা মুখে তুলিয়া দিয়া কহিলাম, "বৌদি তোমার কাছে নিরিবিলি একটা কথা বল্‌ব,"—

দুই চক্ষুতে কৃত্রিম বিস্ময় আনিয়া চাপাস্বরে বৌদিদি কহিলেন, —"খুব মস্ত কাজের কথা বুঝি? সুজাতা থাক্‌লে বলা যাবে না?—আচ্ছা যা'ত সুজাতা, ঠাকুর পোর ঘরে, পানের ডিবেটা নিয়ে আয়তো! আজ তো আর ও ঘরে পান রাখিস্‌নি; আ আমার কপাল, তুই এমনি করেই নাকি,"—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুজাতা লজ্জাবনত মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

"আঃ, তুমি যে কি বল, বৌদি, তোমার ঠিক্ থাকে না!"—

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একটু হাসিয়া বৌদিদি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, "ও, এই কথা—আমি না জানি বিস্তু মুখুয্যে কি একটা মস্ত কথাই বল্‌বেন!"—

"তা' বৌদি, ওর মনে অমন করে একটা ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া কি ভাল হচ্ছে ?"—খুব জোর করিয়া কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জা করিতে লাগিল।

একটা পরম নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিতে হাসিতে বৌদিদি কহিলেন, "যাক্, তা' হলে বল বৌদিদির বুদ্ধির উপর যে আস্থা ছিল, তা' কমে যাচ্ছে ! আমিও তা'হলে রক্ষা পাই ! কেউ যদি কারু বুদ্ধির উপর অটল আস্থা নিয়ে বসে থাকে, তা'হলে তাকে ভারি হিসেব করে, সাবধান হয়ে চল্‌তে হয়। ও অবস্থাটা একটা বোঝার মতই ঘাড়ের উপর চেপে বসে থাকে, একটুও সোয়াস্তি দেয় না !—বাঁচা গেল, এখন বুদ্ধির কোনও ত্রুটী হলেও নিজেকে সেটা মোটেই বিধ্‌বেনা,—কারণ কেউ তো আর অটল আস্থা নিয়ে বসে নেই,—"

এতবড় একটা লম্বা বক্তৃতার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, বিশেষ বৌদিদির মুখের চাপা হাসি দেখিয়া একেবারেই জ্বলিয়া গেলাম !

"বারে, আমি বুঝি তাই বল্লুম !"—

"আচ্ছা, কি বল্লে তুমি ?"—

"আমি বল্‌চি যে !"—

"হাঁ, বেশ্ বল,—"

দূর ছাই ! এমন করিলে কি কথা চলে ! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদির মুখের দিকে চাহিলাম, তখনও তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

"তুমি সব কথাই তো হেসে উড়িয়ে দাও।"—

'আচ্ছা, আর আমি হাস্‌ব না"—বলিয়াই আরও হাসিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ কথার গতি উল্‌টাইয়া—দিয়া কহিলেন, "তা'হলে কাল আমাদের নিয়ে যাচ্ছ? আমি তো অজিতকে পাঠিয়ে দিয়েছি অতুলদের বাসায় একটা খবর দেবার জন্ত। এক-বার মনে করেছিলাম সংবাদ না দিয়েই যাব, কিন্তু তা'হলে তো ওরা প্রস্তুত থাক্‌বে না, হয়তো বেরিয়ে যেতেও পারে।"—

পূর্ব্বের কথাটা যে ইচ্ছা করিয়াই বৌদিদি চাপা দিলেন, তাহা বুঝিয়া মনে মনে একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিলাম। এবং তখনই কি ভাবে কাল্‌কার অভিযানটা শেষ করিতে হইবে, তাহারই আলো-চনা করিতে বসিয়া গেলাম; এবং আমাদের বাসা হইতে বম্পাস্‌ টাউনে যাওয়ার রাস্তাটারও একটা বর্ণনা দিয়া ফেলিলাম। এমন সময়ে অজিত আসিয়া হাজির হইল।

অজিত কহিল, "বৌদি, কে এসেছে জান?" অজিতের মুখের উজ্জ্বল উৎসাহপূর্ণ ভাবটা লক্ষ্য করিয়া বৌদিদি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন, কে আসিয়াছে।

তবু একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা' আমি কেমন করে জান্‌ব অজি,'—কে এসেছে?" বামচক্ষুর কোন্‌টা ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া অজিত কহিল, "হুঁ, তুমি বুঝি বোঝনি?—নিশ্চয়ই বুঝেচ, কে এসেচে!"

বৌদিদি ঘরের বাহিরে যাইতে যাইতে কহিলেন, "আচ্ছা, দেখ্‌চি আমি,—কে!—বারান্দার উপর আল্‌বার্ট দাঁড়াইয়া ছিল।

বৌদিদিকে দেখিয়া সে দুই হাত যুক্ত করিয়া কপালে ছোয়াইল, তার পরই মৃদু হাসিয়া কহিল, 'হাঁ, আমি এসেছি. অজিত আমাকে নিয়ে আসল!"—

"অজিত তোমাকে নিয়ে না আস্‌লে বুঝি আস্‌তে নেই?"— বলিয়া আল্‌বার্টের পিঠে ও মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিলেন।

আল্‌বার্ট ভারি খুসি হইয়া কহিল, "সে আমি আস্‌তে পারি, কিন্তু হয়তো আপনাদের আরামকে নষ্ট কর্‌তে পারি বলে আসিনে!"—

এই সরল বিদেশী বালকটীর অসামান্য ভদ্রতাজ্ঞান ও শিষ্টাচার দেখিয়া বৌদিদি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন।

"ওমা, এতটুকু ছেলে, তার কত হিসাব দেখ! তা তুমি যখন ইচ্ছে তখনি এস, অ্যাল্‌বার্ট! আমাদের বাঙ্গালীর বাড়ীতে আস্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকার নাই তো,—বুঝ্‌লে?"—

আল্‌বার্ট ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এ বাড়ীতে কিছু-দিন আসিয়া যাইয়া সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, যে বৌদিদির কথা-গুলি কত সত্য! এখানে স্নেহের দাবী যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কতখানি গভীর হইয়া উঠে, তাহা সে এই কয়দিনের মধ্যেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

বৌদিদি কহিলেন, "আল্‌বার্ট তুমি চা খাবে?" আল্‌বার্ট মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনি যদি সুখী হন খাইতে পারি।"

—"শোন একবার ছেলের কথা, আমি সুখী হলে খাবে,

নইলে নয়!—হাঁ, আমি খুব খুসী হব, আরও খুসী হব যদি রোজ একবার এসে এখান থেকে চা খেয়ে যাও!"—

আল্‌বার্ট তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া অজিতের মুখের দিকে চাহিল। 'সুখী' কথাটা বুঝিলেও আল্‌বার্ট 'খুসী' কথাটা ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না। অজিত ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিলে, আল্‌বার্ট হাসিতে লাগিল।

"অজিত আমাকে বাঙ্গলা শিখাইতেছে;—ও বলে আমি খুব দ্রুত শিখিতে পারিব, কিন্তু আমি যে কোনও কাজের না আছি, অজিত তা' স্বীকার করবে না!"

আল্‌বার্টের মুখে বিদেশী ভঙ্গিতে উচ্চারিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলা ভারি মিষ্ট শুনাইতেছিল। "কেন এখনি তো তুমি বেশ ভাল বাঙ্গলা বলতে পার!—আরও ভাল পারবে নিশ্চয়ই!"—

আপনার কথা শুনিয়া আমি খুব 'খুসী' হইলাম!"

আল্‌বার্টের মুখে এখনই 'খুসী' কথাটার প্রয়োগ শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

সুজাতা এতক্ষণ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিল। এখন ষ্টোভে চায়ের জল গরম করিবার জন্য চলিয়া গেল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের রঙ্গিন্ লেখা মেঘের শীর্ষে শীর্ষে তখনও জ্বলিতেছিল। বিরল বিন্যস্ত বৃক্ষগুলির তরুণ পল্লবের উপর দিয়া শেষবার বুলাইয়া লইতে লইতে, সন্ধ্যার সূর্য্য, পৃথিবীর বুকের উপর হইতে রশ্মিজাল গুটাইয়া লইলেন। কিন্তু তখনও একটা কোমল গোলাপী আভা পশ্চিমাকাশটাকে

রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। এবং সারা আকাশ বাতাসও যেন সেই মিঠা রঙ্গে ভরিয়া গিয়াছিল।

সুন্দর তাহার মোহিনী মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিয়া যখন বিশ্বকে অমৃত পরিবেশন করিতে থাকে, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের নেশায় চরাচর মাতাল হইয়া উঠে এবং তাহাকেই নন্দিত করিয়া অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়া লয়।

যখন বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন চলিতে থাকে; সে গুরু-স্পন্দনের প্রত্যেক কম্পনটী মুখর হইয়া উঠিয়া জানাইয়া দেয়—

"ওরে, এ সুন্দরের খেলা তাহারি কাছে ধার করিয়া পাওয়া যে তোর বুকের কাছে কখন নীরবে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে; এবং তোরই মুখের দিকে নিমেষশূন্য নয়নে জন্মজন্মান্তর চাহিয়া রহিয়াছে!"

কিন্তু সেই অমৃত পরিবেশনের অন্তরালেই যে দেবাসুরের সংঘাত লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহাত প্রথমটা চোখে পড়ে না! হঠাৎ পিসিমার ব্যস্ততাপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—"ও বৌ, ওরে বিনু, শীগগির আয়, সুজাতার কাপড়ে ষ্টোভের আগুণ ধরে গেছে যে! ওরে সর্ব্বনাশ,—কি হলরে!"—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাকঘরের দিকে ছুটিয়া গেলাম। সুজাতা ভিতরের বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং সাড়ীর আগুণটা নিভাইবার জন্য দুই হাতে চেষ্টা করিতেছে!

কেমন করিয়া আগুন নিভানো যায়, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একেবারে দিশাহারা হইয়া তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। জলের

জল ঘটীবাটী টানায় ধুম পড়িয়া গেল। এবং চারিদিকে এমন একটা বিশ্রী গোল সকলেই সৃষ্টি করিয়া তুলিল, যাহাতে বুদ্ধি স্থির কাহারই থাকিল না, শুধু একটা হুটাহুটীই লাগিয়া গেল। কিন্তু সেই দারুণ মুহূর্ত্তে হাতের কাছে এমন কোনও জিনিষই জুটিল না যাহাদ্বারা ঐ সর্ব্বনাশকর আগুণটাকে নিভানো যাইতে পারে।

মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপরই, রাশ্‌ছেঁড়া উন্মত্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতই একজোড়া বুটের খটাখট্ শব্দ সমস্ত গোল নিমেষ-মধ্যে ডুবাইয়া দিল, এবং একটী গৌরদেহ বিপুল বলশালী বালক ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গায়ের 'ওয়াটার প্রুফ্‌টা দিয়া সুপ্রভাকে জড়াইয়া ধরিল। সাড়ীর প্রান্তে প্রান্তে যে আগুণ ছিল, তাহা তাহার বাঘের থাবার মতই প্রকাণ্ড দুইটা থাবা দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

প্রায় পাঁচমিনিট পর্য্যন্ত সকলেই সংজ্ঞাহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথমেই বৌদিদি অগ্রসর হইয়া গিয়া আল্‌বার্টকে একেবারে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তাঁহার দুই চোখের জল গড়াইয়া গড়াইয়া আল্‌বার্টের সোণালী চুলগুলির মধ্যে আশ্রয় লইতেছিল।—

"ওরে আমার মানিক ভাই, কোন্ দেবতার পূজার আশীর্ব্বাদী ফুল তুই, আজ এখানে এসে এম্‌নি করে প্রাণ দিয়ে গেলি!"—

পিসিমা,—যিনি আল্‌বার্ট বারান্দায় না উঠিতেই ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইতেন, সেই পিসিমাও সকল ভেদ ও শুচিতা ভুলিয়া,

এবং সেই সন্ধ্যাবেলায় যে পুনরায় স্নান করিতে হইবে সেটাও একেবারেই উপেক্ষা করিয়া, আল্‌বার্টের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "ওরে, এরা দেখ্‌তেও ঠাকুর দেবতার মত, এদের শক্তি সাধ্যিও যে সত্যিকার ঠাকুর দেবতার মতই রে! এ না এলে, আমার বাছা যে হট্টগোলের মধ্যে পুড়েই মারা যেত।"

বাড়ীশুদ্ধ লোকগুলির যাহা শক্তিসাধ্য তাহার যথেষ্ট পরিচয় আমরা প্রদান করিয়াছিলাম। সুতরাং সকলেই একটু বিশেষ করিয়া লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলাম।

আল্‌বার্ট একটু মৃদু হাসিয়া সুজাতার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখি, কোথায় পুড়েছে!"—

সুজাতার দুই হাতে কতকগুলি ফোস্‌কা পড়িয়াছিল এবং শাড়ীর প্রান্তের আগুণেও পায়ের স্থানে স্থানে একটু আঁচ লাগিয়াছিল। আল্‌বার্টের হাত দু'খানা টানিয়া লইয়া বৌদিদি দেখিলেন, থাবা দুইটা খুব লাল হইয়া উঠিয়াছে!

আল্‌বার্টের হাতে ও সুজাতার পোড়া যায়গাগুলিতে বৌদিদি যখন ঔষধ দিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং নন্দন পাহাড়ের উপর হইতে বাতাস ঝড়ের বেগে আসিয়া দরজা জানেলার উপর মাথা খুঁড়িতেছিল!

১৩

জীবনে ছোটবড় অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহা চিত্তের উপর এমন কতকগুলি গভীর রেখা পাত করিয়া যায়, যে

রেখাগুলিকে সারাজীবন ভরিয়া চেষ্টা করিয়াও বেশ নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলা যায় না।

সুজাতার সাড়ীতে এই আগুণলাগা ব্যাপারটাও আমার কাছে ঠিক্ তেমনি একটা ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহার কাছে যাইতেই তাহার মুখের সেই নিতান্ত অসহায় ভাবটা যে কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং সে যে কতখানি বল পাইয়াছে, তাহা আমার মুখের দিকে একবার মাত্র তাহার চকিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়াই আমাকে বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, শুধু এই কথা কয়টাই কাল সন্ধ্যা হইতে আজকার দুপুর পর্য্যন্ত বারবারই মনে পড়িতে লাগিল।

গভীর রাত্রিতে বিশ্ব যখন সুষুপ্তিময়, এবং একটা বিপুলকায় নিদ্রিত জন্তুর গভীর নিশ্বাসের মতই, নন্দন পাহাড়ের দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহের শব্দটা আমার মুক্ত জানেলার ফাঁক দিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল, তখন আমি বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া শুধু এই পরমবিস্ময়কর কথাটাই বারবার মনে মনে আলোচনা করিতে-ছিলাম, যে, এমনটা ভিতরে ভিতরে ঠিক্ কখন ঘটিয়া গেল,—কখন এবং কেমন করিয়া আমার অন্তরটা ভিতরে ভিতরে সুজাতার দিকে এতটা অগ্রসর হইয়া গেল? এবং এই অগ্রসর হওয়ার পরিচয়টা এতদিন আমার কাছে তেমন করিয়া ধরা পড়ে নাই কেন, যেমন ধরা আজই পড়িয়াছে? ঠিক তখনি এই কথা মনে করিয়া বারবার শিহরিয়া উঠিতেছিলাম, যে আমিতো তাহার জন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই।—ঐ নিষ্ঠেদ

আল্‌বার্ট, যে আমাদের কেহই নহে, সে উপস্থিত না থাকিলে কি বিশ্রী ব্যাপারই ঘটিয়া যাইত!

ঐ শাড়ীর আগুণের দীপ্তালোকে যখন আমার এত দিনকার গোপন খবরটী দেখিয়া লইয়া শিহরিয়া উঠিলাম, ঠিক্ তখনি কে যেন হাত পা বাঁধিয়া, আঁটিয়া আড়ষ্ট করিয়া দিল এবং সহস্র চেষ্টা সত্বেও কেমন করিয়া যে ঐ পরম সর্ব্বনাশকর আগুণটাকে নিভাইয়া ফেলিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না —শুধু নিষ্ফল চেষ্টা ও দুরন্ত উদ্বেগ লইয়া সারা ঘরে ছুটিয়া বেড়াইলাম। দুইহাতে মাখিয়া যে ঐ আগুণের খানিকটা উত্তাপ গ্রহণ করিব, সেটুকুও পারিলাম না!

ক্ষুদ্র বালক আল্‌বার্ট যখন আগুণ নিভাইয়া দিয়া হাসিতে লাগিল, এবং নিজের আগুণে ঝল্‌সানো পরমসুন্দর রাঙ্গা হাত দুইখানিকে বৌদিদির দিকে অগ্রসর করিয়া দিল, তখন আমি একটা প্রকাণ্ড অক্ষত দেহ লইয়া দণ্ডায়মান্ রহিলেও, ঠিক্ অনুভব করিতেছিলাম, আমার বুকের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।

দুই চক্ষে লজ্জা ও বেদনার কুণ্ঠা লইয়া সুজাতার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার শ্রান্ত-দৃষ্টি কখন আমার মুখের উপর নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহা এক অনব্যক্ত প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া কি আমাকেই নন্দিত করিতেছিল?

বাহিরের বাতাস নিদ্রাভঙ্গের পর ঘরের জানেলার কাছে আসিয়া ক্রুদ্ধ জন্তুর মতই হাঁপিতেছিল!

বহুদূরে মেঘশূন্য আকাশের গায়ে একটী নক্ষত্র জ্বলিতেছিল; তাহার কিরণরেখা জানালার পথ দিয়া আমার শিয়রের কাছে আসিয়া নামিয়াছে এবং মুখের দিকে কাহার ধ্রুব দৃষ্টির মতই অনিমিখ হইয়া রহিয়াছে। সেই নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের স্নিগ্ধ জ্যোতির ভিতর দিয়া যেন, নিবিড় প্রীতি ক্ষরিত হইতেছিল; সে যেন কাহার মুগ্ধ আঁখির তারকা—প্রিয়ের অন্বেষণে ফিরিতেছে!

কিন্তু ও ধ্রুব দৃষ্টি যে আমার চির পরিচিত!—

কোথায় গেল আকাশের সেই স্নিগ্ধ তারকা!—ও যে আমার কক্ষের মধ্যে, আমারই শিয়রের কাছে নামিয়া আসিয়াছে, এবং কাহার মুগ্ধদৃষ্টির মধ্যেই আশ্রয় পাইয়া মিশাইয়া গিয়াছে!

পরমসুন্দর একখানি মুখ; কুঞ্চিত কেশ—ঝাপিয়া নামিয়াছে; মৃদুহাস্যে পুষ্পপুটতুল্য অধর রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!—

বুদ্ধিতে উজ্জ্বল; প্রীতিতে কমনীয়; ভঙ্গিমায় রমণীয়; এ কাহার মুখ! কাহার মুখ!

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, ভোরের নির্ম্মল আকাশ সুনীল ও স্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

মৃদু বায়ুপ্রবাহ কক্ষের মধ্যে পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছিল, এবং প্রিয়জনের স্নিগ্ধ নিশ্বাসের মতই আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর আসিয়া লাগিতেছিল!

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়িল সুজাতাকে!

সুজাতা ঐ অদূরের কক্ষের মধ্যেই রহিয়াছে, এবং ঠিক্ এই

মুহূর্ত্তেই হয়তো এই পুষ্পগন্ধবাহী বায়ুপ্রবাহ তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চূর্ণকুন্তল উড়াইয়া, তাহার সুপ্তিমগ্ন শ্রান্ত দুই চোখের উপরে স্নিগ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া যাইতেছে!

একটা বিপুল পুলক ও আনন্দ বুকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল! দুয়ার খুলিতেই দেখিলাম বারান্দার সিঁড়ির উপর পা ঝুলাইয়া দিয়া সুজাতা বসিয়া রহিয়াছে! ভোরের বায়ু তাহার চূর্ণকুন্তল উড়াইতেছিল; সূর্য্যোদয়ের প্রথম আভাসে পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, সুগৌর কপোলের উপর তাহারই স্নিগ্ধ আভা আসিয়া লাগিয়াছে!

চকিত ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া সুজাতা একবার আমার মুখের দিকে চাহিল; তারপর ধীরে ধীরে তাহার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল!

মনে হইল; তাহার সেই চকিত ম্লান দৃষ্টিটুকুর মধ্যেই যেন আমার নূতন বিস্ময়ের চিরন্তন ইতিহাসটী লুকানো রহিয়াছে!

এমন সময়ে অজিত আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল, "দাদাবাবু"—

"কিরে অজিত, তুই এত ভোরেই উঠে এলি!"—

"দিদি উঠিয়ে দিল যে! আমি কি আর নিজে ইচ্ছে করে কখ্খনো উঠি, দাদাবাবু!"—

কোনও কথা না বলিয়া অজিতকে দুইহাতে টানিয়া কোলের মধ্যে আনিলাম।

ইচ্ছা হইতেছিল, সুজাতারই অনুরূপ শ্রীসম্পন্ন ঐ প্রিয়দর্শন বালককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া রাখি!—

১৪

সেদিন অতুলদের কম্পাস্ টাউনের বাসায় যাওয়ার কথা ছিল, সুজাতা ঠিক্ সুস্থ হইয়া উঠে নাই বলিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

রমাপ্রসন্ন বাবু কলিকাতা গিয়াছিলেন; কয়েকদিন তাঁহার সংবাদ না পাইয়া সুজাতা উদ্বিগ্ন ছিল। সেদিন বারটার পর ডাক আসিল।

অজিতকে ডাকিয়া বলিলাম, "অজিত, তোমার বাবার চিঠি আছে"—

অজিত ঘরে ছিল না, বোধ হয় আলবার্টের কাছে গিয়াছিল। সুজাতা দুয়ারের কাছে একটু আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার ভাবিলাম চিঠিটা হাতে হাতে দিয়া আসি। কিন্তু অকারণেই বুকের ভিতর একটা রক্তঝলক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; একটু গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া ডাকিলাম, "বৌদি,"—

পাক্ ঘরের দিক্ হইতে উত্তর আসিল, "এই যাচ্ছি"—

সুজাতা ইতিমধ্যেই পাক ঘরের সম্মুখের বারান্দার কাছাকাছি যাইয়া পড়িয়াছে।—

—"বাবার চিঠি এয়েছে বোধ হয়, এনে দাও না দিদি!"—

"কেনরে, তুই আন্‌তে পারলিনি?—ঠাকুরপো তাই ডাক্‌চে বুঝি?—যা', তুই নিয়ে আয়, আমি তরকারীটা নামিয়ে যাচ্ছি, তাই বলিস্!"—

—"ও দিদি তোমার পায়ে পড়ি, তোমার তরকারী আমি

থামিয়ে দেব'খন্।—তুমি চিঠিটা এনে দাও, কদ্দিন বাবার চিঠি পাইনি!"—

বৌ'দদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "না, পার্‌বনা আমি, কি দায় পড়েচে আমার!"

বৌদিদি ফিরিয়া পাকঘরের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার চোখের প্রান্ত কৌতুক-হাস্যরঞ্জিত হইয়া নাচিতেছিল। সুজাতা রাগিয়া কহিল, "না পার্‌লে, পাক ঘরেও তোমাকে ঢুক্‌তে দিচ্ছিনে, দেখাচ্চি তোমার মজাটা!"—

সুজাতা বৌদিদিকে অতিক্রম করিয়া পাকঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল; আমি ভিতরের হল্‌টা পার হইয়া আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া—

"না কারু যেতে হবে না, এই যে চিঠি!"—বলিয়াই বিপুল সাহসে নির্ভর করিয়া একগোছা চিঠিই সুজাতার দিকে ফেলিয়া দিলাম। সুজাতা ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলি কুড়াইয়া লইতেছিল; একখানা চিঠি একটু দূরে পড়িয়াছিল,—সেখানা বৌদিদির।

চিঠির উপরের দাদার হাতের মুক্তার মত অক্ষরে "শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী" লেখাটা যেন বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

বৌদিদির মুখের উপর দিয়া একটা দ্রুত শোনিতোচ্ছ্বাস ক্ষণিকের জন্য খেলিয়া গেল। তবু জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিলেন,

"ও ইন্দিরা দেবীর চিঠি, তুই নিস্ কেন?"

"নিচ্ছি আমার খুসি! ইঃ আমি চোখ্ রাঙানির ভয় রাখিনে,"—বলিয়াই চিঠি কুড়াইয়া লইয়া সুজাতা মুহূর্ত্তের মধ্যে পাক ঘরে প্রবেশ করিয়া খিল আঁটীয়া দিল।

মনে মনে একটু হাসিয়া লইয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে কহিলাম, "পাক হয়েছে, বৌদি? ভারি খিদে পেয়েছে যে!"

হাঁ, পাক হয়েচে বই কি? ও সুজাতা, দোর খুলে দে, তরকারীটা ধরে যাবে যে!

"সে আমি দেখ্‌ব—তুমি ঐ দোর গোড়ায় ধ্যান ধরে বসে থাক!"

বৌদিদি সপ্রতিভ কণ্ঠে কহিলেন, "আচ্ছা আমি ঠাই পিড়ি করে নিচ্ছি, তুই তরকারীটা নামিয়ে রাখ্, ভাজাগুলি আমি এসে তৈরী করে নেব; খুব সাবধান কিন্তু, আবার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিস্‌নে!"

—"বারে, আমার অসুখ যে! আমি তোমার তরকারী নামাতে পার্‌বনা, শেষটা পুড়ে মরি আর কি?"—একটা মৃদু চাপা হাসির সঙ্গে মাখামাখি হইয়া পাকঘরের ভিতর হইতে কথাগুলি আসিতেছিল।

"তোকে তো পার্‌তে আমি বলিনে রাক্ষুসী! তুই দোর খুলে দে, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি!"

মৃদুকণ্ঠের উত্তর শুনা গেল, "তোমার বুঝি আর তর সইচে না, না?"

"এখনি তোর এমন মুখ ফুটেচে! সর্ব্বনাশী, আচ্ছা থাক্ তুই, তোকে আমি দেখাচ্ছি!"—

পাক ঘরের দিক হইতে কোনও উত্তর আসিল না, শুধু উত্তপ্ত তৈলের উপর ভাজা ছাড়িয়া দেওয়ার তীব্র শব্দের দ্বারা সুজাতা জানাইয়া দিল, যে সে বৌদিদির ও সব কথা মোটেই গ্রাহ্য করিতেছে না।

হলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি সবই শুনিতেছিলাম। বৌদিদি মনে করিয়াছিলেন, আমি চলিয়া গিয়াছি। সুজাতার কাছে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া হলের কাছে আসিয়াই দেখিলেন, যে, তাঁহার পরাজয় কলঙ্কের সাক্ষীস্বরূপ বিনয় মুখুয্যে সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

তখন সবটা ঝাল আমার উপরেই ঝাড়িবার জন্য, বৌদিদি কহিলেন, "ও, এ তাহ'লে তোমারি কারসাজি!"

বিস্মিত দৃষ্টিতে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে কহিলাম, "ওদিকে বুঝি কিছু সুবিধে করে উঠ্‌তে পারলেনা, তাই আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এলে,—নয়?"—

কথা ফিরাইয়া লইয়া বৌদিদি কহিলেন, "আচ্ছা, দেখ্‌ত ওর কাণ্ডটা, কাল অমন মরতে মরতে বেঁচে গেছে, আর আজই আবার পাক ঘরে খিল এঁটে বস্‌ল!—এ পাগ্‌লি বললেও শুনবে না; কি বিপদেই আমি পড়েছি যে একে নিয়ে!"—

বৌদিদির কোমল প্রাণটা যে কোথায় পড়িয়া আছে, তাহা গোড়া হইতেই ঠিক্ জানিতাম। সুজাতা যে এত বিশ্রী কাণ্ডের পরও আজই আবার আগুনের কাছে গিয়াছে, সেইজন্য তিনি সত্যই অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন!—

"ঠাকুর পো, সত্যি তুমি একটু বলে দিয়ে যাওনা, ও দোরটা খুলে দিক্। ওযে খিল আঁটা ঘরে আগুণের কাছে রয়েচে, তা' মনে মনে সত্যি একটুও স্বস্তি পাচ্ছিনে!"—

—"খুব বল্লে কিন্তু! আর আমার ওটা যে একেবারেই আসেনা, তা' তো তুমি জানই, বৌদি'!—"

কিন্তু যাহার কথা সুজাতা শুনিবে, সেই দুর্দ্দান্ত সিপাহী ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সমস্ত শুনিয়া কহিল, "ও আমি ঠিক করে দিচ্ছি বৌদি" দুই লাফে পাক ঘরের কাছে যাইয়া দুয়ারে সবলে ধাক্কা দিয়া অজিত কহিল "তোর আর ওস্তাদি কর্‌তে হবেনা, দিদি; কাল তোর বিদ্যে খুব বোঝা গেছে, —দোর খুলে দে'!"

সুজাতা হাসিতে হাসিতে দুয়ার খুলিয়া দিয়া কহিল, "দিদি, বাবা তোমার কাছেই চিঠি লিখেছেন, আমার কাছে ত নয়।"

বৌদিদি ভ্রুভঙ্গি করিয়া কহিলেন, "তা' তুই আমার চিঠি খুল্লি কেন না? তোর ভারি সাহস বেড়েচে দেখ্‌চি, পরের চিঠি খুলিস্!"

সত্যই সুজাতার সাহস বাড়িয়াছিল এবং আজ যে বৌদিদির হারিবার পালা, তাহাও সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল।

বৌদিদি হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "দে, আমার চিঠি"—

সুজাতা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "ওমা, আমি তোমার চিঠি খুল্‌ব কেন, দিদি? সবই তোমার কাছে শিখ্‌চি, ও বিদ্যেতো, কই, এক দিনও শেখাওনি! এই নাও তোমার চিঠি!"

—বৌদিদির প্রসারিত হস্তের উপর সুজাতা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে দাদার চিঠিখানা দিয়া দিল।

মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিলাম, বৌদিদি তাঁহার জীবনে এমন অপ্রতিভ আর কোনও দিনই হন নাই। হলের মধ্যে দণ্ডায়মান নীরব সাক্ষীটী তাঁহাকে আরও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বৌদিদি কহিলেন, "তুই থাক্ রাক্ষুসী, একমাঘে কিছু আর শীত যাচ্ছেনা!"

কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে এই বাক্যবাণ প্রয়োগ করা হইতেছিল, সে তখন আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ক্রমাগতই হাসিতেছিল।

সুজাতাকে জব্দ করিবার জন্য আমার দিকে ফিরিয়া বৌদিদি কহিলেন, "দেখ্‌চ, ঠাকুরপো! আমার চিঠিখানা তো দেবেই না, আরও ও হেসেই গড়াচ্চে!"

আমি হলের ভিতরেই রহিয়াছি জানিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সুজাতার হাসি নিভিয়া গেল; এবং রমাপ্রসন্ন বাবুর চিঠিখানা বৌদিদির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া সুজাতা দ্রুতপদে পাকঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

চিঠিখানার উপরে সুজাতার নাম লিখিত ছিল; ভিতরের চিঠিটা রমাপ্রসন্নবাবু, তাঁহার মালক্ষ্মী, বৌদিদির কাছেই লিখিয়াছিলেন!

সুজাতাকে তাহার কৌতুকলীলাময়ী মূর্ত্তিতে দেখিবার এই-ই সর্ব্ব প্রথম অবসর পাইয়া বুকের মধ্যে একটা নূতন গীতির নিবিড় ছন্দ তালে তালে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

১৩

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সেদিনকার ডাকে যে প্যাকেটটা পাইয়াছিলাম, তাহাই খুলিয়া ফেলিলাম।

একখানি সুদৃশ্য বাঁধানো 'রামায়ণ'; কলিকাতায় একজন বন্ধুর কাছে লিখিয়াছিলাম, সে পাঠাইয়া দিয়াছে। মলাটের উপরকার সোণার জলে লেখা "সুপ্রাতা" নামটা আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন মৃদু হাসিয়া উঠিল।

সুপ্রাতা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে ভালবাসে এ খবরটা অজিতের কথার মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু 'রামায়ণ' আনাইয়া আজ মনে হইল, সত্যই যেন একটা মহাবিপদে পড়িয়াছি। চিঠি লিখিলেই 'রামায়ণ' প্যাকেট বন্দী হইয়া চলিয়া আসিতে পারে, কিন্তু যাহার জন্য আনীত হইয়াছে তাহার হাতে ঐ রামায়ণখানি পৌঁছাইয়া দেওয়াটাই যেন একটা মহাশক্ত ব্যাপার। তখনই সুপ্রাতাকে ডাকিয়া সহজ, সরলকণ্ঠে যদি বলি, "সুপ্রাতা, এই রামায়ণখানা তোমার জন্য আনিয়েছি,"—সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বলা দূরে থাকুক, কথাটা ভাবিতেই কাণের কাছটা কেন যে এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং বুকের ভিতর হইতে একটা দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস প্রবলবেগে হৃদ্‌পিণ্ডটাকে নাড়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া শিরায় শিরায় বিদ্যুতের স্রোতে বহিয়া যাইবে, তাহা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

অন্যমনস্ক ভাবে টাইলোটা তুলিয়া লইয়া ভিতরের পাতায়

"সুজাতা" লিখিয়াই মনে হইল, কাজটা ভাল করি নাই। ঐ উজ্জ্বল কালো কালীর অক্ষর তিনটা ঠিক্ যেন সাধারণ অক্ষরের মত হয় নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে গাছের গায়ে গায়ে লাগানো সামান্য 'চাপাটীর' মধ্যেও ইংরাজ যেমন নানা সঙ্কেত আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন, মনে হইল, আমার লেখা ঐ অক্ষর তিনটীর মধ্যেও যেন আমার গোপন ইতিহাসের অনেক-খানি পরিচয়, অনেকগুলি সঙ্কেত, যে কেহ খুঁজিয়া পাইতে পারে!

মলাটের উপরকার সোণার জলে লেখা ঠিক ঐ তিনটী অক্ষরই যেন কালীর লেখা এই একই তিনটী অক্ষরের কাছে উজ্জ্বলতায় অনেকখানি ম্লান দেখা যাইতেছিল।

সে অক্ষর কয়টী দপ্তরীর বাড়ীর প্রাণশূন্য যন্ত্রের পেষণের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে;—আর এরা যে ষ্টাইলোর মুখ দিয়া আমার অন্তরের সমস্তখানি উন্মুখ আগ্রহ, স্নিগ্ধ অনুভূতি শোষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে! যে করুণ, কোমল সুর নিশিদিন মর্ম্মবীণায় গুমরিতেছে, এ যে তাহারই স্নিগ্ধ রেশ্ টুকু!

ছুঁরি দিয়া কাটিয়া তুলিয়া ফেলিলে হয় না? আবার কালীর আঁচড় কাটিয়া কাটিয়া অক্ষর কয়টাকে লুপ্ত করিয়া দেওয়া যায় না? এমন করিয়া কাটিয়া কেহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিয়াছে কি?

কে বটগাছের ছাল কাটিয়া তুলিয়াছিল, বিশ্বের ঠাকুরের

বুকের উপর সে ক্ষত আপনার নিষ্ঠুর চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল। ঐ ছুরিকার আঘাত বা কয়টা কালীর আঁচড়ে অক্ষর কয়টা তো মুছিবেইনা, শুধু একটা ক্ষত, একটা চিহ্ন বুকের মধ্যে রাখিয়া যাইবে!

অক্ষর নিশ্চিহ্ন করিবার সমস্ত আয়োজন তো ব্যর্থ হইয়া গেলই; অজ্ঞাতে কখন যে হাতের বহি মুখের কাছে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই, চমকিয়া উঠিয়া "সুজাতার" নামাক্ষর সংস্পর্শ হইতে উদ্যত ওষ্ঠকে ফিরাইয়া লইলাম। হাতের বহি নামাইয়া ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, অজিত আসিতেছে!

অজিত কহিল, "দাদা বাবু, খেতে আসুন"—তারপর টেবিলের উপরকার উজ্জ্বল কারুকার্য্যশোভিত বহিখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিল। বহি তুলিয়া লইয়া যখন দেখিল, তাহার দিদিরই নাম লেখা রহিয়াছে, তখন অজিত আর অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, দুই হাতে বহি আঁকড়িয়া ধরিয়া, "ও দিদি, তোর রামায়ণ; ভারি সুন্দর,—দাদা বাবু আনিয়েছেন," বলিতে বলিতে ছুটিয়া পাকঘরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ দুরন্ত ছেলেটা তো ঘুণাক্ষরেও বুঝিল না, যে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই তাহার দাদাবাবু ঐ বহিখানা কেমন করিয়া ঠিক জায়গা মত পৌঁছাইয়া দিবে, তাহাই ভাবিয়া কতখানি দ্বিধা, কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল।

টেবিলটার কাছে মুহূর্ত্তকাল অপরাধীর মতই দাঁড়াইয়া

রহিলাম; পা দুটা একটু কাঁপিতেছিল; কিন্তু বুকের মধ্যে যে গুরু স্পন্দনটা ক্রমাগতই সাড়া দিতেছিল, তাহাকে ঠিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, সঙ্কোচ অপেক্ষা পুলকের ভাগটাই বেশী পাওয়া যাইত!

অজিতের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে আহারের চেষ্টায় যাইতে হইল, এবং বৌদিদির আক্রমণটা কোন্ পথে আসিবে, তাহার জন্য একটু সতর্ক হইয়া উঠিলাম।

থালাটা কাছে রাখিয়া হাস্যরঞ্জিত মুখে এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে বৌদিদি কহিলেন, "বইটা বাঁধতে যে এক অধিবাসের তত্ত্বের খরচ লেগেচে!"—

পরম নিশ্চিন্ত মনে,—কারণ এই পরম বুদ্ধিমতী নারীর মৃদু-স্বর শুনিয়াই বুঝিলাম, ঝড়টা শুধু আমার উপর দিয়াই যাইবে, সুজাতা পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না,—ছোট বাটীটা হইতে ঘৃতটুকু নিঃশেষ করিয়া পাতের উপর ঢালিয়া লইয়া কহিলাম, "অজি গেল কোথায়?—ও অজিত, খাবিনে?"—

"সে রামায়ণের ছবি উলটোচ্ছে।"—

"ওকে ভাজাটা খুব বেশী ক'রে দিয়ো আজ, বুঝ্লে বৌদি'?"

—"কেন, ভারি উপকার করেছে বুঝি? বইটা হাতে পৌঁছে দেবার দায় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েচে,—নয়? দু'বার ঘরের দোরে গিয়ে ফিরে এসেছি, জান গোঁসাই?"

অজিত আসিয়াছিল, তাহার পাতে সব ভাজাগুলি তুলিয়া দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আহারে লাগিয়া গেলাম।

লজ্জা ও সঙ্কোচ মানুষকে যে এমন করিয়া আনন্দ দিতে পারে, তাহা এর পূর্ব্বে জানিতাম না !

১৩

পরদিন সকালবেলা অনিল আসিয়া কহিল, "ইন্দিরা দি', ত্রিকূট পাহাড় দেখ্‌তে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত তো স্থির হয়ে গেল !"

স্মিতমুখে বৌদিদি কহিলেন, "কে কে যাবে অনিল, আর কি বন্দোবস্তই বা তোরা কর্‌লি তার কিছুই তো জানাস্‌নি,"—

মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনিল কহিল, "বাঃ, সে তো তুমিই যা' হয় ঠিক্ কর্‌বে,"—

"আমিই যদি সব কর্‌ব, তবে তোরা কি বন্দোবস্ত কর্‌লিরে অনিল ?"

"যাওয়াটা যে হবে সেইটেই আমাদের সভায় স্থির হয়ে গেল ; এবং বন্দোবস্তের ভার সবটা তোমার উপর,—এই তো কথা হয়েচে ! আমি তো তাই-ই তোমাকে বল্‌তে এলাম, ইন্দিরা দি' !"—

"তবেই হয়েছে তোদের ত্রিকূট দেখ্‌তে যাওয়া !—আমি ঘরে বসে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব, খুব জোরের সভা কিন্তু তোদের যা' হোক্ !"

"তা' কেন ইন্দিরা দি', তুমি যা' যা' দরকার মনে কর্‌বে আমাদের বল্‌বে"—

"আর তোরা সেইটুকু করে খালাস হবি, কেমন এই তো ?"—

অনিল হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না; একবার বৌদিদির মুখের দিকে চাহিল, তার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "হুঁ"—এমন সময়ে অতুল সশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, "তুমি শুধু হুকুমই করে যাবে, তোমার হুকুম তামিল কর্‌বার লোকের অভাব না হ'লেই হ'ল!"

বৌদিদি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোরা কয়টী জুটেছিস্ কিন্তু বেশ! ওরে, তোরা এমনিই মা বোনের আঁচল ধরা হয়ে থাক্‌বি, যে বাইরের পাঁচটা বন্দোবস্ত কর্‌বার সময়ও আমাদের কাছে হুকুম চাইবি, নিজেরা কিছুই কর্‌বিনে?"

অতুল কহিল, "হুকুম করার চেয়ে হুকুম তামিল করাটাই যে বেশী আরামের, এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালীরা সবাই একেবারে একমত। আর জান কি, এ সব পথেঘাটে চল্‌বার খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত এতই বেশী কর্‌তে হয়, যে যারা বাড়ীতে মা বোনের হাতে খরচাটা কোনমতে পৌঁছে দিয়ে সকল রকমের আরাম পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের এসব পোষায় না! ও যা তুমি বল্লে, সেটা ভারি ঠিক!—আমরা কটিই বেশ জুটেচি! এ সব মুস্কিলের চাইতে আদালতে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করাও চের সহজ বলে মনে হয়, ইন্দিরা দি!"

সুজাতা আসিয়া একখানা শ্বেতপাথরের রেকাবীতে কতক-গুলি পান রাখিয়া গেল। অনিল একবার চকিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপরই দৃষ্টি নত করিয়া লইল, কিন্তু তাহার কাণের কাছটা যে অসম্ভব রকমের লাল হইয়া উঠিল,

সেটা আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

অনেকগুলি চিঠি উত্তরের অপেক্ষায় টেবিলের উপরকার রঙ্গিন প্রস্তরখণ্ডের নীচে জমিয়া উঠিয়াছিল, আমি আমার ঘরে বসিয়া তাহারই উত্তরগুলি লিখিয়া শেষ করিতেছিলাম।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তের পর হইতে আর আধঘণ্টা পর্য্যন্ত আমার লেখা দুইটি ছত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া গেল; আর এতটুকুও অগ্রসর হইতে চাহিল না।

আমি আমার ঘরের মধ্যে টেবিলের কাছে বসিয়া কাগজের উপর কতকগুলি অনর্থক কালীর আঁচড় কাটিতে লাগিলাম; এবং মধ্যে মধ্যে অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

কৃপণের রত্নপেটিকার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িলে, সে সংবাদটা যেমন সর্ব্বাগ্রে কৃপণই পাইয়া থাকে, এবং সে যেমন নিশিদিনই শুধু ঐ একই চিন্তাতেই মহাবিব্রত হইয়া উঠে এবং নিজের মানসিক শান্তিকে ক্ষুণ্ণ ও বিরল করিয়া তুলে, আমার মানসিক অবস্থাটাকেও ঠিক তেমনি দীন ও ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিতে দেখিয়া আমি সত্যই বড় বিস্মিত হইয়া উঠিলাম! অন্তরের মধ্যে এই যে একটা বেদনার মৃদু স্পন্দন, একটা নূতনতর অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম, ইহার পূর্ব্বে আর কোনও দিনই তো এমনটা অনুভব করি নাই। বৌদিদির গলা শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল। তিনি আমার ঘরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই যে এরা এসেচে, ঠাকুরপো, এসনা একবার, তোমার চিঠি লেখা যে আর শেষই হয় না।"

চিঠির কাগজের উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া লিখিতে লিখিতে কহিলাম, "এই চিঠিটা সেরেই যাচ্ছি বৌদি ;—অনেক-দিনের চিঠি সব পড়ে রয়েচে,—আজ এদের উত্তরগুলি লিখে শেষ করবই প্রতিজ্ঞা করেচি"—কিন্তু প্রতিজ্ঞা যে কখন করিলাম তাহাও ভাল মনে পড়িল না। চিঠির কাগজের উপর দৃষ্টি পড়িতেই যে কথাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, তাহা যে আমারই লেখা, তাহাও যেমন নিঃসন্দেহ, এবং সেগুলি যে ঠিক কখন লিখিলাম সেই সমস্যাও আমার কাছে তেমনি বিস্ময়কর হইয়া উঠিল।

মানুষের চিত্তটা একটা অদ্ভুত সৃষ্টি! কত ক্ষুদ্রতম কারণও যে এই মানব চিত্তের উপর রেখাপাত করিতে পারে, দোলা দিয়া যাইতে পারে, তাহার মীমাংসা কোনও বৈজ্ঞানিকের গবেষণার মধ্যে আইসে না। যে কোনও মানবচিত্তের সুখ দুঃখের, বিস্ময়-ক্ষোভের, আশানিরাশার দুর্জ্ঞেয় ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিচয়টি গ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব এবং এই পরিচয় গ্রহণের সমস্ত চেষ্টা ঠিক তখনি ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, যখন মানুষ মনে করে, যে, হয়তো কিছু পরিচয়, কিছু সন্ধান সে পাইয়াছে!

চিঠির কাগজখানা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "আচ্ছা, থাক্, আজ চিঠি নাই বা লিখ্‌লাম। কিন্তু ত্রিকূট দেখতে যাওয়ার দিনটাকে ওই যে সপ্তাহ পরে ফেলা হয়েচে, ওতে আমার মোটেই মত নেই, এবং আজকার সভার

আমার এই আর্জি পেশ্ করে দিচ্ছি, যে, ওদিনটাকে এগিয়ে ঠিক এসপ্তাহের মাঝখানে কোথায়ও ফেলা হ'ক্!"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াই একবার ভিতরের দরদালানের দিকে চাহিলাম, ভাবিয়াছিলাম, সুজাতাকে দেখিব। কিন্তু সেখানে চাকরটা কি করিতেছিল,—সুজাতাকে দেখা গেল না!

শান্তকণ্ঠে অনিল কহিল, "আমারও ঠিক ওই মত, যদি যেতেই হয়, তাহ'লে যত শীগ্‌গির যাওয়া হয় সেই-ই ভাল।"

অতুল কহিল, "আমাদের মতে কিছুই হবে না দেখ্‌চি—কারণ আমরা যতই মত ঠিক্ করি ততই সেটা গুলিয়ে যায়, আচ্ছা, ইন্দিরাদি যা' বলে তাই করা যাবে।"—

অজিত ও আলবার্টকে ফটকের কাছে দেখা গেল। বৌদিদি একটু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, কারু মত নিয়ে কাজ নেই; আলবার্ট যা বলবে আমরা তাই করব"—

অজিত আসিয়া মলিন মুখে জানাইল, আল্‌বার্ট চলে যাচ্ছে বৌদি,"—অজিতের কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল।

"চলে যাচ্ছে, সে কিরে?"—

"হাঁ বৌদি, সায়েব ছুটি নিয়েছেন; দেশে তাঁর মার অসুখ, তাই দেখতে যাবেন, আর মাত্র দিন পনের এখানে আছেন!"

আল্‌বার্ট চলিয়া যাইবে শুনিয়া সকলেই একটু বিশেষ করিয়া কষ্ট অনুভব করিতেছিল। এই প্রিয়দর্শন বিদেশী বালকটি সকলের নিকট হইতেই প্রচুর স্নেহ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পিসিমা ঘরের ভিতরে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। মালাটা একবার কপালে ছোঁয়াইয়া উঠিয়া আসিলেন এবং দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া উদ্বেগপূর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যিই বাছা চলে যাচ্ছে, বৌমা? আহা, এমন সোণার চাঁদ ছেলে আর আমার চোখে পড়েনি, চিরজীবি হক্ বাছা, মার কোল জুড়িয়ে থাক্।"—

"আমি যখন খুব ছোট্টটী ছিলাম, তখনি আমার মা স্বর্গে গেছেন, পিসিমা"—এই মাতৃহীন বালকের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের ছিন্ন অর্দ্ধোচ্চারিত করুণ কাহিনীটী, সেখানকার বাতাসে একটা ব্যথার ইতিহাস রচনা করিয়া তুলিল!

বৌদিদি দুইহাতে আলবার্টকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে তাহার স্বর্ণাভ কোমল চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন। চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছিল, পিসিমা একবার আঁচলে চক্ষু মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ও গুরু—গুরু!" তার পর আল্‌বার্টের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সকল দুঃখ কষ্টের অতীত হয়ে তিনি চলে গেছেন সত্যি, কিন্তু সেখান থেকে তিনি তোমাকে দেখচেন এবং তোমার মঙ্গল বিধান করচেন, একথাটা মনে করে কোনো দুঃখ ক'রো না বাছা!"—

আল্‌বার্টের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, "আমিও বেশী কিছু ভাবিনে পিসিমা, একদিন ত তাঁর কাছে যাবই; তবে কেউ তার মাকে ডাকচে, অথবা দুঃখে কষ্টে পড়ে মার কাছে ছুটে যাচ্ছে, দেখলেই মনটা কেমন করে ওঠে, এই যা!"

আল্‌বার্ট হাসিতে লাগিল; সে হাসিটুকু ঠিক্ বর্ষণোন্মুখ মেঘের আড়াল হইতে বিচ্ছুরিত অত্যন্ত বিবর্ণ শশাঙ্কলেখার মতই অনুজ্জ্বল. ম্লান!

অজিত কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা তো আমারও নেই, আলবার্ট"—সুজাতা দুয়ারের কাছে আসিয়া সব শুনিতেছিল, অজিতের কথা শুনিয়া সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া আসন্ন ক্রন্দনের বেগটাকে রোধ করিতে যাইতেছিল।

এই দুইটী অপরিণতবয়স্ক বালক এ করিতেছে কি?

সেই ম্লান সন্ধ্যার কোমল আলোক এমন করিয়া তাহারা ব্যথায়, বেদনায় ভরিয়া দিল যে, সকলেরই চিত্ত একটা অনির্দ্দিষ্ট ক্ষোভে ও ব্যথায় ভরিয়া গেল এবং প্রত্যেকেরই চোখের কোণে কোণে অশ্রুর আভাস জাগিয়া উঠিল।

হঠাৎ অজিত কহিল, "তা আমি ত ওজন্যে কিছু ভাবিনে। আমি প্রায় রোজ রাত্রেই মাকে স্বপ্ন দেখি, কাল রাত্রেও তিনি আমার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছেন, আচ্ছা তুই যদি আমার কাছে থাক্‌তেই এত ভালবাসিস্ তা' হলে আমি তোকে নিয়ে যাব!"—অজিত তাহার ক্ষুদ্র অধরপুট একটু প্রসারিত করিয়া দিল এবং কথাটা যে সুজাতাকে খুব বেশী আঘাত করিবে, যেন ইহা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুজাতা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে অজি', চুপ কর, চুপ কর! তুই এম্‌নি করে বলিস্, বাবা শুন্‌লে বাঁচ্‌বেন? তোর কি মায়া দয়া একটুও নেই?"—

"বা, মার কাছে যদি যেতে পাস্, তা হলে কি তুই যাস্নে দিদি ?"—কিন্তু এই অবোধ বালকটীর চোখেও অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া নন্দনপাহাড়ের দিকে চাহিল। নন্দনপাহাড়ের দিক্ হইতে একটা প্রবল বায়ুপ্রবাহ 'হা হা' শব্দে বহিয়া আসিয়া দরজা জানেলার উপর আছাড়িয়া পড়িতেছিল। মনে হইল, যেন শোকার্ত্ত কেহ বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতেছে এবং একটা গভীর বিষাদের নিবিড় কালো ছায়া সেখানে মূর্ত্ত হইয়া নামিয়া আসিতেছে!

১৭

সেদিন ত্রিকূট পাহাড়ের নীচে একটা খোলা জায়গায় বিশ্রামের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র দলটী আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমরা দেওঘর ছাড়িবার ছয় সাত ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমাদের দুই বাসার চাকরদের ও অতুলদের পাকের ঠাকুরকে বৌদিদি কতকগুলি জিনিষপত্র সঙ্গে দিয়া একটা গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একটু দূরে কতকগুলি গাছের আড়ালে সতরঞ্চ টানাইয়া তাহারা পাকের আয়োজন করিতেছিল।

অজিত, আলবার্ট মহা আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছিল; বৌদিদি তাহাদের ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে অজিত, তোরা রোদে অত ছুটিস্নিরে! একটা অসুখ করে বস্বে!"—

কিন্তু বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের "রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না" এই সনাতন উপদেশটী বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে ও পরে এ পর্য্যন্ত

কোনও বালক প্রতিপালন করিবার তেমন আগ্রহ দেখায় নাই। সুতরাং ওটাকে স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়া বর্ণপরিচয় ছাপিলে কোনও ক্ষতি নাই. এই কথা জানাইয়া দিয়া অতুল উঠিয়া পড়িল।

অতুলের স্ত্রী তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠণের মধ্য হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি, ও উপদেশটা প্রথম ভাগেই তবু রয়েছে, আইনের বইতে যে মোটেই নেই ; কিন্তু যারা আইন্ নিয়ে থাকে তারাই আবার রোব্‌কে অতটা ভয় করে কেন ?"—

"নিষেধটাকে অগ্রাহ্য করাই মানুষের স্বভাব, কিন্তু যেটা সম্বন্ধে নিষেধের কোনও বাধা বন্ধন নেই, সেইটেকেই তবু মানুষ মান্‌তে চায়।"—

বৌদিদি কহিলেন, "ও তর্ক তবে তোরাই কর্! আমি দেখে আসি ওরা পাকের বন্দোবস্ত কতদূর করে তুলল!"—সুজাতা ও বিদ্যুৎ একটু দূরে একটা গাছের তলায় বসিয়া কথা বলিতেছিল। বৌদিদিকে উঠিতে দেখিয়া তাহারাও উঠিল। অতুলের স্ত্রী ঈষৎ হাসিয়া বৌদিদির অনুসরণ করিল।—

অনিল একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়াছিল ; সে তাহার দৃষ্টি দূর দিগন্তের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল, "মানুষের কাছে আনন্দ কখন্ কোন্ মূর্ত্তিতে ধরা দেয়, তার কিছু ঠিক্ নেই। আস্‌বার পূর্ব্বে মনে করেছিলাম, যে এখান থেকে কত আনন্দের স্মৃতিই বহন করে নিয়ে যাব! কই, তা' তো সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না! আমার মনে হয় ও জিনিষটাকে খুঁজ্‌তে গেলেই দুর্ল্লভ হয়ে ওঠে!"

একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি পুরীতে সমুদ্র দেখেছেন!"

"দেখেছি, কেন বলুন তো?"—

"শান্ত সমুদ্রের অন্তঃস্থল থেকে সব সময়েই একটা গভীর আন্দোলন উঠচে, যার প্রকাশ শুধু তার নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে,—তরঙ্গের আকারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। আমার মনে হয়, সে যে পরিপূর্ণ, তারি আনন্দ তাকে অমন নৃত্যমুখর করে তোলে। মানুষের আনন্দ তখনি সম্পূর্ণ হয়, যখন তার প্রকাশ বাইরে আর দেখা যায় না,—শুধু গভীর ছন্দে অন্তরের মধ্যেই জেগে ওঠে!"

"হবে!—কিন্তু এমন ঢের মানুষ আছে, যারা আনন্দের খবর পেলে বিশ্বসংসারকে না জানিয়ে থাক্‌তে পারে না! এবং আমার মনে হয় ঠিক ঐখানটাতেই তার চরম সার্থকতা।—আচ্ছা, সমুদ্র সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?"—

অনিল একটু হাসিয়া কহিল, "পূর্ব্বের ও কথাটার পক্ষে ও বিপক্ষে ঢের বল্‌বার আছে! সে যাক্।—সৃষ্টির মধ্যে দুটো জিনিষ আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের চোখে দেখে থাকি; সমুদ্র জিনিষটা অত্যন্ত বিস্ময়কর, কিন্তু তার চেয়েও সহস্রগুণে বিস্ময়কর ঐ অনন্ত নীল আকাশ!"—

হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "তার চেয়েও বিস্ময়কর আর একটা জিনিষের নাম আমি কর্‌তে পারি"—

অনিল তাহার শান্তদৃষ্টি উৎসারিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "কি সে?"

"যেখানে সকল কবিত্বের শেষ এবং সকল আনন্দের আরম্ভ, সে জিনিষটা হচ্ছে,—হাস্‌বেন না অনিলবাবু! নারীর কালো চোখ!" কথাটা বলিয়াই এবং অনিলকে উত্তর দিবার বিন্দুমাত্রও অবসর না দিয়া যেখানে পাকের বন্দোবস্ত হইতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেলাম।

আমাকে দেখিয়া বৌদিদি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌চ ঠাকুরপো, এরি মধ্যে সুজাতার সঙ্গে বিদ্যুতের ঝগড়া বেধে গেছে।"

বিদ্যুৎ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল; সুজাতা অত্যন্ত শান্তমুখে দাঁড়াইয়া আঙ্গুলে আঁচলের খুঁট্‌ জড়াইতেছিল।

"ওরা দুজনেই জিদ্‌ ধরেচে, পাক কর্‌বে! কিন্তু আমি বল্‌চি যে থাক্‌ না, আজ আর কারু পাক করে দরকার নেই।"

বিদ্যুৎ ও সুজাতা উভয়েই চকিত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিল।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে বিবাদ মীমাংসার মতই এটাও একটা যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তাহা আমাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইলেও, যাহারা বিচার প্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার লাভ সত্যই খুব সহজ হইল না।

তাহারা কথাও কহিল না, অথচ ঠিক্‌ মনোমত উত্তরটি না পাওয়া পর্য্যন্ত নতমুখে দাঁড়াইয়াই রহিল, এবং আঙ্গুলে আঁচলের খুঁট জড়াইয়া জড়াইয়া ও পায়ের নখে মাটী খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এই কথাটাই বারংবার জানাইয়া দিতে লাগিল যে মীমাংসা তাহাদের মনঃপুত না হইলে তাহারা ঠিক খুসি হইতেছে না। কিন্তু আজ

এই পাহাড়ের পাদদেশে উদাস প্রান্তরের মাঝখানে ইহারা দুইটীতে যে হাঁড়ি কাঠি লইয়া বসিবে এটা যে কোনও মতেই হইতে পারে না তাহা দৃঢ়স্বরে জানাইয়া দিয়া কহিলাম, "বৌদিদি, তুমি ওদের নিয়ে একটু ঘুরে এসনা কেন,"—কিন্তু বৌদিদিও নড়িবার কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া কহিলেন, "তা' যাচ্ছি, কিন্তু তার পূর্ব্বে কর্ত্তারা বাহিরে মাতামাতি করে ফিরে এসে যখন মুখ শুকিয়ে ঠিক ঐ মলিন হাঁড়ি কাঠির সম্মুখেই দাঁড়াবেন, তখনকার ব্যবস্থাটা একটু না করে রেখে স্বস্তি পাচ্ছি কই ?"

"সে তো ঐ ঠাকুর চাকর রয়েচে, ওরাই সব ঠিক করে নেবে এখন"—

একথার উত্তরে বৌদিদি শুধু একটু হাসিলেন; সে হাসিতে স্নেহামৃত ক্ষরিত হইতেছিল। বিদ্যুৎও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; সুজাতার মুখের দিকে চাহিলাম। স্বেদবিন্দু তাহার ললাটের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে, মৃদু বায়ু তাহার চূর্ণ কুন্তল উড়াইতেছে! লজ্জারক্ত কপোলের বর্ণসুষমার উপর দোদুল্যমান্ কর্ণভূষার হরিৎ আভা লাগিয়া লাগিয়া তাহার সুগৌর মুখখানিকে সপ্তমীর দেবীপ্রতিমার চারুমুখশ্রী প্রদান করিয়াছিল।

কখন অনিল আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিয়া চাহিয়াই দেখিলাম অনিলের চকিত দৃষ্টি সুজাতার মুখের উপরেই নিবদ্ধ রহিয়াছে!

অনিলের সে দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর ও তন্ময় এবং একেবারেই আশা-শূন্য।

যে একবার ভালবাসিয়াছে, তাহার ঐ দৃষ্টিকে চিনিতে এক-টুকুও বিলম্ব হয় না! মুহূর্ত্তের জন্ত আমার দুই চক্ষু জলিয়া উঠিল। কিন্তু এত বিরক্তি লইয়া যাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সে পরম নিশ্চিন্ত মনে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'ইন্দিরা দি,' ঐ বড় পাথরের ঢিবিটার পাশেই ভারি সুন্দর একটা যায়গা দেখে এসেচি,—তোমরা দেখ্‌বে? এস না?"—

যে এমন সহজ সরল কণ্ঠে কথা বলিতে পারে, তাহার উপর রাগ হয় না। কিন্তু তবু বুকের ভিতর একটা নূতনতর জালা অনুভব করিতেছিলাম! এ কিসের জ্বালা? এ কিসের দহন?—

হাতের কাজগুলি শেষ করিয়া ফেলিয়া স্মিতমুখে বৌদিদি কহিলেন, "চল্ অনু, তুমিও চল্‌না ঠাকুরপো!—ওকি, তোমার মুখ চোখ্ অমন দেখাচ্ছে যে? অসুখ করেনি তো?"

একটা পাত্রে কিছু সরবৎ তৈয়ারী করা ছিল; এক গেলাস আমার হাতের কাছে ধরিয়া কহিলেন, এই টে খেয়ে নাও তো! অনেকটা ভাল বোধ কর্‌বে।" সরবৎটা নিঃশেষে পান করিয়া গেলাসটা ফিরাইয়া দিতে দিতে কহিলাম, "না, ও কিছু নয়, বৌদি'; এখনি সব ভাল হয়ে যাবে। আচ্ছা, চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।" কিন্তু যাইবার উৎসাহ যে আমার একেবারেই ছিল না, তাহা বোধহয় বৌদিদির তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইল না।

—"থাক্‌না, আমরা এখন নাই বা গেলাম, অনু!" একখানা হাতপাখা জিনিষপত্রের মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া বৌদিদি

কহিলেন, "এই পাথরটার উপর বেশ ভাল হয়ে বস দেখি, আমি একটু হাওয়া দিচ্ছি!—যে পাহাড় কাটা রোদ্, এতে কি আর মাথা স্থির থাকে?"

নিতান্ত বাধ্য ছাত্রের মতই পাথরখানার উপর বসিয়া পড়িলাম, এবং বৌদিদির হাতের পাখার বাতাসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইলে ভাবিতে লাগিলাম, এ আমি হইয়াছি কি? এ কোন্ মরুভূর মধ্যে, তৃষ্ণার্ত্ত আমি আসিয়া পৌছিয়াছি? শ্যামবনানীর কোমল ছায়া এখানে নাই; বিহঙ্গের কাকলী এখানে শুনা যায়না; মেঘের ছায়ায় এ দারুণ রুক্ষপথ ছায়াবৃত হইয়া উঠে না; —শুধু দূরে—অতি দূরে, দেখা যায় সেই স্বপ্নপুরী; যেখানে রঙ্গের উপর রঙ্গের খেলা চলিয়াছে;—সবুজের নেশায় আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে; পুষ্পে ফলে, লতিকার পল্লবে নন্দনশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে! সুন্দরের রথচক্রের ছায়ায় ছায়ায় লাস্যলীলার কোমল নর্ত্তন চলিয়াছে; এবং সেই চিরকিশোর বিশ্বের ঠাকুরটির বাঁশরীর উন্মুখ আবাহনগীতি আকাশ বাতাস পাগল করিয়া দিতেছে!

কিন্তু কোথায় কাহার কাছে ঐ স্বপ্নপুরীর সোণার চাবি কাটীটি! কাহার মায়াস্পর্শ, কাহার নিবিড় সঙ্কেত, কাহার স্নেহদৃষ্টিটুকু, আমাকে ঐ স্বপ্নরাজ্যের পথ দেখাইয়া দিবে?—

লতাগুল্মের সাহায্যে খণ্ডপ্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া অজিত ও আলবার্ট ত্রিকুটের উপর খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। সেখানে এক প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া অজিত তাহার দূরবীণটা পরম যত্নে বাহির করিয়া লইল; এবং বারংবার চীৎকার করিয়া

জানাইয়া দিল যে তাহারা ঐ দূরবীণটার সাহায্যে বহুদূরের দৃশ্য চমৎকার দেখিতে পাইতেছে; এমন কি অতুলদের কম্পাস্ টাউনের বাসাটীও একেবারে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

বৌদিদি মহাব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "ও অনিল, ওদের ডেকে বল্, ওরা নেমে আসুক্।—ওমা, এমন বিপদে পড়েচি এদের নিয়ে এসে! কখন ওরা পাহাড়ে চড়ে বস্‌ল, তা'তো কিছুই দেখিনি!—ও অজিত, অজিত!"—

অতুলের স্ত্রী হাসিতে হাসিতে কহিল,—"ঠাকুরঝি কি ক্ষেপলে? পুরুষছেলে পাহাড়ে উঠেচে তা'তে হয়েচে কি? আর তোমার ঐ আল্‌বার্টটী তো পাহাড়ের দেশের লোক! ওরা ঠিক্ নেমে আস্‌বে, ভয় কি?"—

বিদ্যুৎও হাসিতেছিল, কিন্তু সুজাতার মুখ একেবারে কাগজের মতই সাদা হইয়া গেল। সে বৌদিদির কাছে সরিয়া আসিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "ও দিদি, তুমি ওদের নেমে আস্‌তে বল, সত্যি আমার ভয়ে বুক কাঁপছে!"—

একটু হাসিয়া অনিল উঠিয়া পাহাড়ের দিকে গেল; অজিত ও আল্‌বার্ট অনিলের দিকে দূরবীণ বাগাইয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল, এবং একটু পরেই কাঠবিড়ালীর মতই স্বচ্ছন্দে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতে লাগিল। সুজাতা রুদ্ধনিশ্বাসে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল;—এবং যতক্ষণে তাহারা ঠিক্ মাটীতে আসিয়া না দাঁড়াইল, ততক্ষণ বৌদিদির আঁচল চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

অজিত কাছে আসিতেই সুজাতা কহিল,—"আচ্ছা অজিত, তুই এমন সর্ব্বনেশে হয়ে উঠলি কেন বল্‌তো? তোর কি ভয় নেই রে!"

আল্‌বার্ট কহিল, "ভয় কি দিদিমণি? ও যে বাঙ্গলা দেশের মুখ উজ্জ্বল কর্‌বে প্রতিজ্ঞা করেচে; ওর ভয় করলে চল্‌বে কেন?"—

"তোমার ভয় করেনা আল্‌বার্ট?"

"আমি আইরিশ, আমার ভয় কর্‌তে নেই, দিদিমণি! আমাকে হয়তো যুদ্ধে গোলাগুলি খেয়েই মর্‌তে হবে!" আল্‌বার্ট তাহার দুই পকেটের মধ্যে হাত দুইখানি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুজাতা শিহরিয়া উঠিয়া অজিতের হাত চাপিয়া ধরিল এবং নিতান্ত অসহায় ভাবে একবার চারিদিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

বৌদিদি কহিলেন, "ষাট, ষাট! অমন কথা বল্‌তে নেই, লক্ষ্মী ভাইটী আমার।"

আল্‌বার্ট একটু বিস্মিতভাবে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "আমাকে যে একজন বড় জেনেরাল্ হতেই হবে দিদিমণি!"

বৌদিদি আল্‌বার্টের গর্ব্বিত মুখখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পরম বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, "ওমা, এতটুকু ছেলে বলে কি? এর এখনি এত সাহস! সাধে কি আর ওরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে আমাদের এত বড় দেশটার উপর রাজত্ব কর্‌চে!"

অজিত তাহার ক্ষুদ্র বন্ধুটীর প্রশংসাবাণী শুনিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুজাতার দিকে চাহিয়া কহিল, "শুন্‌লি দিদি,—আর তুই তো তোর অজিতের বাসায় ফিরতে পনের মিনিট দেরী হলেই একেবারে কেঁদে অস্থির হ'স্‌! আমরা যে এমন ভীরু, সে শুধু তোদের ঐ চোখের জলের জন্যে!"

"আচ্ছা, তুই থাম্‌, খুব পাকা পাকা কথা শিখেচিস্‌ কিন্তু। আর তুই অমন করে পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠ্‌তে পাবিনে।—যদি পড়ে যেতি!"—সুজাতার কণ্ঠস্বর আবার অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল।

"হাঁ, আমি এখনও ছোট্টটী আছি আর কি? বার বছরের সময় বাদল কি করেছিল জানিস্‌? আমি তো আর কদিন পরেই চৌদ্দ বছরে পড়ব!"

অজিত বিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তির মত মুখশ্রী অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া প্রথমে সুজাতার তারপর বৌদিদির মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখের এই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবটী দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

এই আনন্দের হাটের মধ্যে আমার কোনও যোগ ছিল না। দূরে বসিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিলাম। ঐ সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ শিশু—কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়াই বিশ্বসংসার উহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে! ঈর্ষার জ্বালা নাই, নিরাশার দহন নাই, শুধু পরিপূর্ণ আনন্দের কল্পনা ও আয়োজন!

এই তরুণ হৃদয়গুলিই এই মাটীর পৃথিবীটাকে বিচিত্র ও রঙ্গিণ করিয়া তুলে;—আশা ও বিশ্বাসের নির্ম্মল আলোকে প্লাবিত করিয়া দেয়!

এমন সময় মাথায় চাদর জড়াইয়া অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল।

"খালি পেটে এমন যে মধুর হরিনাম, তাও বেশীক্ষণ করা যায় না। আর এতো পর্ব্বতারোহণ ও বসন্তের তীক্ষ্ণ রৌদ্র-সেবন। আহারের ব্যবস্থা কি, ইন্দিরা দি?—এদিকে নাড়ী পর্য্যন্ত যে হজম হয়ে যাবার যোগাড় ?"

অতুলের স্ত্রী টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল ; অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "এলেন দিগ্বিজয় করে। এখানে এই পাহাড়ের তলায় খিদে বল্লেই বুঝি খাবার পাওয়া যাবে ?"

বৌদিদি মৃদুহাসিয়া, অতুলের স্ত্রীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, তুই থাম্‌রে ফাজিল্‌ বৌ!" তারপর অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "খাবার কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছি, অতুল। তোমরা সবাই-ই চলনা, কিছু খেয়ে নাও ; তারপর পাক তো হ'ল বলে!"—

অজিত আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "তা এতক্ষণ বল্‌তে হয়, বৌদি! কিন্তু কোথায় রেখেচ তুমি সেগুলি ? আমি তো একবার চালডালের পুটুলিগুলি সব খুঁজে দেখে এসেচি, কই কোথাও তো কিছুটী পেলাম না!"

পরম হৃষ্টস্বরে অতুল কহিল, "সব কাজের ভার যখন ইন্দিরা দি'র উপর দেওয়া হয়েছে, তখন কিছুরই যে অভাব হবে না, ও আমি ঠিক জান্‌তাম্‌!"—

শালপাতার উপর খাবার গুলি সাজাইয়া দিতে দিতে বৌদি

সুজাতা ও বিদ্যুৎকে কহিলেন, "ওরে তোরা দুটীতে সবাইকে খাবার দিয়ে আয়না?" অজিত দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া একটা ঠোঙ্গা তুলিয়া লইল। আল্‌বার্ট একখণ্ড পাথরের উপর বসিয়া সম্মুখের আর একখণ্ড প্রস্তরকে টেবিল করিয়া লইয়াছিল।

সুজাতা তাহার সেই অপূর্ব্ব টেবিলটীর উপর খাবারের ঠোঙ্গা রাখিতেই অজিত বলিয়া উঠিল, "তুমি বাপু, বাঙ্গালী হয়ে গেছ, আর টেবিলের মায়া কেন?"—

আল্‌বার্ট হাসিয়া কহিল, "না, আমি আইরিশ্‌, টেবিল ছাড়ব না; তবে আমি বাঙ্গলাকে ও বাঙ্গালীকে খুব ভালবাসি।"

"ঠিক্ কথা, যে আইরিশ, সে আইরিশই থাক্, এবং যে বাঙ্গালী সে বাঙ্গালীই থাক্।"—অতুল কথা বলিতে বলিতে পরিষ্কার ঘাসের উপরেই বসিয়া গেল এবং খাবারের ঠোঙ্গা টানিয়া লইয়া সেই দিকেই মনঃসংযোগ করিল।

বৌদিদি কহিলেন, "তুমি আস্‌বেনা, ঠাকুরপো? যা না, তোরা কেউ ঠাকুরপোকে খাবারের পাতাটা দিয়ে আয়না?"

কিন্তু সুজাতা কি বিদ্যুৎ কেহই নড়িল না। বিদ্যুৎ তাহার আরক্ত ওষ্ঠপুট, দাঁতে ঈষৎ চাপিয়া একবার অপাঙ্গে আমার দিকে চাহিল; সুজাতা কোনও দিকে না চাহিয়া বৌদিদির পাশে বসিয়া পড়িয়া শালের পাতার উপর খাবার সাজাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অতুলের স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, "ওসব কিছু ওদের দিয়ে হবে না, ঠাকুরাণী; তুমি নিজেই দিয়ে এস না?"

তখন বৌদিদি খাবারের পাতাটা তুলিয়া লইতেই আমি কহি-

লাম, "ওর চেয়ে আর এক গেলাস সরবৎ আমাকে দাও না, বৌদিদি ; খাবার খেতে ইচ্ছাটা বড় নেই।"—

"আচ্ছা খাবারও খাও, সরবৎও দিচ্ছি!"

অজিত তাহার খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া গম্ভীর মুখে বলিয়া উঠিল, "আমারও খাবার খেতে ইচ্ছে নেই, সরবৎই খাব।"—

সকলেই হাসিয়া উঠিল!

সেইদিন সন্ধ্যার অনেক পরে আমাদের গাড়ী মন্থর গতিতে, উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া, সবুজ ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া দেওঘরে প্রবেশ করিল।

ঠিক্ আমার সম্মুখের আসনেই সুজাতা ও বৌদিদি বসিয়াছিলেন। গাড়ীর কোণের অন্ধকারের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া সুজাতাকে দেখিতেছিলাম।

খোলা জানেলার পথে চাঁদের আলো তাহার অনাবৃত মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। বাতাস তাহার অযত্নবিন্যস্ত চুলের রাশি উড়াইয়া কর্ণভূষণ দুলাইয়া, কেশতৈলের স্নিগ্ধ বকুলগন্ধ বহন করিয়া আনিয়া মুখে চোখে মৃদুল স্পর্শ দিয়া যাইতেছিল।

এই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যে কতবার তাহার অঞ্চলের মৃদুস্পর্শ আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে, কতবার তাহার ত্রস্ত চকিত দৃষ্টি আমার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য উৎসারিত হইয়াছে।

সেই অদ্ভুত চক্ষু দুইটির নিবিড় দৃষ্টি কি শান্ত, কি অচঞ্চল! বিশ্বের সমস্ত রহস্যের বিপুল ইতিহাসটা যেন ঐ দৃষ্টির মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে।

অতুলদের 'গাড়ী' বম্পাস্ টাউনের দিকে চলিয়া গেল। পথে একবার গাড়ী রাখিয়া আল্‌বার্টকে তাহার কুঠিতে পৌঁছাইয়া দিলাম।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম রমাপ্রসন্নবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৮

পরদিন ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; একটা অত্যন্ত বিশ্রী অবসাদ ও তিক্ততায় সমস্ত মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রিতে সুনিদ্রা তো হয়ই নাই, শুধু এই কথাই বার বার মনে হইয়াছে, যে, এ কোন্ গ্রহ আমার ভাগ্যাকাশে দেখা দিল! ইহার প্রবল আকর্ষণে, আমার সুখ দুঃখের যে ধারাটী আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্যে কতখানি বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে? এবং কোন্ মন্ত্রেই বা ইহার তুষ্টিসাধন করিয়া আমার দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের, জয় পরাজয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিব?

—হায়রে মানুষের মন! কত অল্প আঘাতেই এ মন বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে! দারুণ সংঘাতে এই মনই আবার কোথা হইতে বিপুল শক্তি সংগ্রহ করে! এর বহু বিচিত্রতার মধ্যে নিশি-দিন কত ভাঙ্গাগড়াই চলিতেছে!—এর হাসি কান্নার চুণিপান্না দিয়া মানুষের জীবনেতিহাসের প্রত্যেক পাতাটী সাজানো রহিয়াছে! এ যে কখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, আবার কখন বজ্র-তুল্য কঠিন হইয়া উঠে, সে রহস্যের মীমাংসা চিরদিনই ত দুজ্ঞেয়

রহিয়া গেল! ওরে, এমনি মানুষের অন্তহীন সাহস সে এই মন নিয়াও আবার খেলা করিতে চায়! এ যে আগুন নিয়া খেলায় চেয়েও কত ভীষণ ও সর্ব্বনাশকর, তাহা সে একবারও তো হিসাব করিয়া দেখে না!

একটা তুচ্ছ চোখের চাহনির বিশ্লেষণ লইয়াও যে প্রকাণ্ড একটা রাত্রি এত উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়া যাইতে পারে, এ কথাটা বহিতে পড়িলেও এই দিনের পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। মনে করিতাম, ওটা শুধু কবিরই কল্পনা ও অতিরঞ্জন! কিন্তু এ তুচ্ছতম কথাটাও যে এমন করিয়া আমার কাছে সত্য হইয়া উঠিবে, তাহা জানিতাম না!

তবু যদি ঐ খানটাতেই ও ব্যাপারের সব শেষ হইয়া যাইত! কিন্তু সংসারের সব ব্যাপারেই দেখা যায়, ঠিক তেমনটী হয় না! ওর শুধু কি এইই কারণ, যে, অলক্ষ্যে যে দেবতাটী বাস করেন, তিনি মানুষের হৃদয় লইয়া খেলা করিতে ভাল বাসেন; এবং সেই খেলার মধ্য দিয়াই মানুষকে জানাইয়া দেন, যে, সে কতখানি কাঙ্গাল, কতখানি তুচ্ছ!

অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া গড়িয়া তোলার মালিকও তিনি; আবার মানুষ যাহা অন্ধগর্ব্বে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে ব্যর্থ, নগণ্য করিয়া দেওয়ার কর্ত্তাও তিনি!

তবু কি মানুষ তাহা বুঝিতে চায়! সে নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়া তুলিয়া, কবে যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পথের ধূলায় মিশাইয়া যায়, তাহাও জানিতে পারে না!

দুয়ারে মৃদু করাঘাত শুনিয়া হঠাৎ মনে হইল, এ যেন সেই অলক্ষ্যের দেবতারই আহ্বানসঙ্কেত! মানুষ তাহার নিত্যকার হাসি কান্নার মধ্যে, খেলা ধুলার মধ্যে যাহার আগমন সংবাদ স্বপ্নেও মনে করে নাই, নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে বজ্রপাতের মতই, মধ্যে মধ্যে এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর অপ্রত্যাশিতকে তিনি হঠাৎ আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া যান! মাঝে মাঝে একটা সর্ব্ব বিধ্বংসী ভূকম্প আসিয়া যেমন নদ-নদীর চিরন্তন গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যায়, অথবা সেই শস্য শ্যামল কূলপ্লাবিনী নদীর ধারাটীকে মুছিয়া দিয়া যায়; খাতটীকেও চিহ্নহীন করিয়া দিয়া পলকের মধ্যে সেই অন্তহীন রহস্যের ক্রোড়ে ফিরিয়া যায়, এও তেমনিই আসিয়া পড়িয়া নিমিষের মধ্যে দারুণ হাহাকার জাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়!

"ঠাকুরপো কি উঠেচ?—একবার এদিকে আস্তে হবে,"—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলাম। "কি বৌদি?"—

"আমি আরো দুবার এসে ফিরে গেছি, ঠাকুরপো! অজিতের যে খুব বেশী জ্বর হয়ে পড়্ল!—বাবা তোমাকে ডাক্তে বল্লেন!"

হাঁ, ঠিক্ এম্‌নি একটা কিছু আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম। কথাটা শুনিয়া বুকের ভিতরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল!

জীবনে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যে গুলি সূচনাতেই জানাইয়া দেয়, যে সহজে ঘটিয়া যাইবার জন্য তাহারা আত্মপ্রকাশ করে নাই! তাহারা অনেক দুঃখ দিবার জন্য, এবং অনেকখানি কাড়িয়া লইবার জন্যই আসিয়াছে।

—"কাল অত পাহাড়ে রোদ্ লেগেচে; আজ ছেলে এমন হয়ে পড়্ল; মোটেই আমার ভাল লাগ্‌চেনা, ঠাকুরপো! এ জ্বর যে সহজে যাবে এ তো একবারটীও মনে হচ্ছেনা! মা মঙ্গলচণ্ডী, বাছাকে ভাল করে দাও;—বাবা বৈদ্যনাথের পায়ের কাছে এসে—দূর ছাই,—কি যে মাথামুণ্ড বকে যাচ্ছি! আর এত ছাইভস্মও মনে আসে!—"

হায়রে, এ যে আমার মনেরই সেই কথা;—সকলের বুকের মধ্যেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে!

বৌদিদি একবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই চোখের জল যে ছাপাইয়া নামিয়া আসিতে চাহিতেছে, তাহা বোধ করা তাহার সাধ্য ছিল না।

একটা কিছু যেন বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিতেছিল; কোনও মতে শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম,—

"তুমি কি ক্ষেপ্‌লে বৌদি? জ্বর হয়েচে, সেরে যাবে; এত ভয় পেলে চল্‌বে কেন?"—কিন্তু বুকের ভিতরে ভিতরে কে যেন মৃদু শিহরিয়া উঠিতেছিল, এবং জানাইয়া দিতেছিল, এর মধ্যে উপেক্ষা করিবার কিছু তো নাই-ই; নিজের মনকে যুক্তি তর্ক দ্বারা ভুলাইবারও কিছু নাই।

—"তুমি চল, একবার তাকে দেখে এস; তারপর যা' হয় ব্যবস্থা কর! সুজাতা তো একেবারে কেঁদেই আকুল হয়ে উঠেচে,"—

সুজাতার ঘরে অজিত শুইয়া রহিয়াছে। শিয়রের কাছে রমাপ্রসন্ন বাবু; পার্শ্বে সুজাতা। আমি ঘরের মধ্যে যাইতেই সুজাতা উঠিয়া বৌদিদির কাছে আসিয়া তাঁহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল! কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দুই চক্ষু ফুলিয়াছে; অশ্রু সজল দুই চোখের দৃষ্টি সে একবার আমার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া যেন জানাইয়া দিল, "এবার তোমারই হাতে আমার অজিতকে তুলে দিচ্ছি, ওগো, ওকে আরাম করে দাও,—সুস্থ করে দাও!"—

রমাপ্রসন্ন বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "এ পাগ্‌লিকে নিয়ে তো বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেলাম, বাবা! আমার মা লক্ষ্মী তো ওকে প্রবোধ দিতে যেয়ে হা'র মেনেচেন্; ও সেই শেষ রাত্রি থেকে কেবলি তোমাকে ডেকে আন্‌বার জন্য বল্‌চে, কাল্‌কার সমস্ত দিনের কষ্টের পর একটু বিশ্রাম কর্‌চ বলে, আমি আর ডাক্‌তে দিই নি, তবু কি শোনে, দু'তিন বার মা লক্ষ্মীকে পাঠিয়েচে; এখন তুমি একবারটী ওকে বেশ করে দেখ;—তারপর যা হয় কর; আমি তো এর জ্বরের সূচনাটাই ভাল দেখ্‌চিনে, বাবা!"

আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সুজাতা এতখানি নির্ভর কোথা হইতে পাইল, যে, বিপদের সূচনাতেই শুধু আমাকেই বার বার তাহার মনে পড়িয়াছে!

আমার বুকের ভিতরটা নিংড়াইয়া সমস্তখানি স্নেহপ্রীতি ঐ বালিকার দিকেই অগ্রসর হইয়া যাইতে চাহিতেছিল; এবং তাহাকে এই কথাটাই বারংবার জানাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল,

যে, মানুষের শক্তির তুচ্ছতার তো একেবারেই সীমা নাই, কিন্তু শেষ রক্তবিন্দু দিলেও যদি ঐ বালককে এতটুকুও আরাম দেওয়া যায়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না!

কিন্তু মানুষের গর্ব্বেরও যে সীমা নাই তাহা তো তখন তেমন করিয়া মনে করি নাই!

দুনিয়ার সমস্ত বন্ধন, সকল স্নেহের আকর্ষণ দুই হাতে ছিন্ন করিয়া দিয়া যে চলিয়া যায়, সে হউক না এতটুকু শিশু, তবু তাহার বিদায়-মুহূর্ত্তের কাকুতি, তাহার বেদনার পরিমাণ, তাহার রোগ যন্ত্রণার অসীম বিস্তার তাহারই শিয়রে বসিয়া তাহারই মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, তাহাকে বাহু বেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া রাখিয়া, এত-টুকুও কি উপশম করিয়া দেওয়া যায়? ওরে, অশ্রু ঢালিয়া যদি ক্ষুদ্র শিশুর ওষ্ঠপুটের এতটুকুও কাকুতি কমানো যাইত।—প্রাণ দিয়াও, যদি কোলের শিশুকে ফিরাইয়া আনা যাইত!

কিন্তু তা' কি হয়?—বলিতে পার, বিশ্বের মালিক কোথায় বসিয়া এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন?

কিন্তু এ হইল কি? কেমন করিয়া সকলের হৃদয়েই একযোগে অমঙ্গল আশঙ্কা কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে!—

একটু জোর করিয়াই সমস্ত অবসাদ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলাম, "বাঃ আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কাল একটু অত্যাচার বেশী পড়েচে, তাই হঠাৎ এ জ্বরটা এসেচে, ও ভয় করবার কিছু নেই—"কিন্তু অজিতের দিকে চাহিতেই আমার বুকটা একেবারেই দমিয়া গেল; এবং অজিত যখন তাহার দুই রক্তচক্ষু

মেলিয়া আমার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল, তখন আর আমার এতটুকুও সাহস রহিল না।

ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া অজিত অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, "দাদা-বাবু, আমার দূরবীণটা ?—" সুজাতা তাড়াতাড়ি ড্রয়ারের ভিতর হইতে দূরবীণটা বাহির করিয়া লইয়া আসিয়া কহিল, "ও অজি, এই যে তোমার দূরবীণ,"—কিন্তু অজিত যখন দূরবীণ লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল না এবং ঘরের দেওয়ালের দিকে দুই চক্ষুর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল ; তখন বিছানার পাশে দূরবীণ ফেলিয়া দিয়া সুজাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল !

অজিত আর একবার চক্ষু চাহিল ; বোধ হইল যেন কাহাকে খুঁজিতেছে,—তারপর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "বৌদি, খাবার চাইনে, আমি সরবৎই খাব !"—

কিন্তু তাহার হাসিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল ; এবং তন্মুহূর্ত্তেই, এই কথা বলিবার জন্য একটু বেশী শ্রম হইল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, অজিতের দুই হাতের মুঠি শক্ত হইয়া আসিল;—চক্ষুর তারকা ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। বৌদিদি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে অজি যে কেমন হয়ে পড়্ল!" সুজাতা ছুটিয়া আসিয়া অজিতের মুখের উপর পড়িয়া ডাকিল, "ও অজি,অজি !—

বৌদিদি বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে অজিতকে টানিয়া কোলের মধ্যে আনিলেন।

"নাঃ তোমরা দেখ্‌চি সব মাটী কর্‌বে! দেখ্‌চনা ওর ফিট্‌ হচ্ছে, জল আন, বৌদি ;—জল আন !"—

বৌদিদি উঠিয়া জল আনিলেন এবং অজিতের চোখে মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন।

আমি সুজাতার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিলাম, "অমন অস্থির হলে চল্‌বে না, সুজাতা, যদি কেঁদে ওকে ভয় দাও, ও ঘরে তোমাকে রেখে আস্‌ব!"—

সুজাতা চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি গোল কর্‌ব না, কাঁদব না; শুধু অজির শিয়রে চুপ করে বসে থাক্‌ব;—তা' আমাকে থাক্‌তে দেবেন ত?"—

"হাঁ, তা' দেব,—" এই এক মুহূর্ত্তে,—এবং অত্যন্ত বিপদের মুহূর্ত্তে,—যখন মানুষ সব চেয়ে নির্ভরের স্থানটীকে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহে,—ঠিক্ তখনি আমি এই একমাত্র ভাইয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে বোন্‌কে বসিতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তৃত্ব কেমন করিয়া যে এত অনায়াসে গ্রহণ করিলাম, তাহা মনে করিয়া এত উদ্বেগের মধ্যেও আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সুজাতাও ঠিক এমনি একদিন বৌদিদির পীড়ার সময়ে সেবার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু মানুষ যে কতই স্বার্থপর তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাই! সুজাতার উপর যে এতখানি জোর খাটাইতে পারিতেছি, এমন সহজভাবে তাহাকে সম্বোধন করিতে পারিতেছি,—সেটা যদিও এতখানি বিপদের মুহূর্ত্ত মধ্যে,—তবুও একটা মৃদু পুলকানুভূতি যে ভিতরে ভিতরে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল, তাহা মনে করিয়া নিজের কাছেও লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিলাম।

চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া

যখন বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বাহিরে চৈত্রের প্রখর রৌদ্র তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতই শাণিত হইয়া উঠিয়াছে!

দূরে ডিগরিয়া পাহাড়ের শ্যামল শ্রীর মধ্য দিয়া তাহার প্রস্তর রাশির ধূসর বর্ণ, প্রখর দিবালোকে অভিনেতার রাজবেশের অন্তরাল দিয়া তাহার বিপুল দৈন্যের মতই, ফুটিয়া বাহির হইতেছিল!

সহরের দিক্ হইতে মিশ্র কর্ম্ম-কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে; পথের উপর দিয়া ছিন্ন মলিন বসন ভিক্ষুক সুর তুলিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে! তাহার ক্লান্তিও নাই, সুরের পরিসমাপ্তিও নাই!—এ যেন বিশ্বের গোপন বেদনার চিরন্তন কাহিনীটী, বাঁশীর সুরে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে! অনাদিকাল হইতে ঐ ভিক্ষুক মাটীর পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া তাহার বাঁশী বাজাইয়া ফিরিতেছে! কেহ উহাকে আদর করে নাই; কখনও কাছে ডাকে নাই। তবুও সেই বেদনার সুরটীকে চিরকাল জাগাইয়া রাখিয়াছে; এবং যখন যাহাকে ইচ্ছা সেই সুর শুনাই-তেছে!—

আজ নন্দন পাহাড়ের পাদদেশের এই রৌদ্রতপ্ত বাড়ীটাকে বেষ্টন করিয়া উহার করুণ বেদনার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে; সমস্ত অন্তরটা পীড়িত করিয়া তাহারই নিষ্ঠুর রেশ শিহরিয়া উঠিতেছিল!—

এ কোন্ দারুণ নির্ম্মম ছন্দ?—এ কোন্ করুণ গীতিনাট্যের বেদনাপূর্ণ অভিনয়?—

—ওগো, মর্ম্মতন্ত্রীর সহিত এই সুরের যোগকে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব?—মুছিয়া চিহ্ন-হীন করিয়া দিব?

১৯

জীবনটাই একটা স্মৃতির বিরাট স্তূপ! ইহার মধ্যে অমর, অক্ষয় অশোকের স্তম্ভ আছে; মর্ম্মর স্বপ্ন তাজ-মহালও আছে! আবার অতীত গৌরবের বিধ্বস্ত নিদর্শন হস্তিনানগরীর ধ্বংসাবশেষও আছে। একটু খুঁড়িয়া, একটু খুঁজিয়া দেখিলেই হাহাকারে পরিপূর্ণ শোকের নির্ম্মম আঘাতে স্তম্ভিত, ধ্বংসের উদ্দাম লীলায় বিধ্বস্ত, সহস্র পম্পেই চিন্তা ভস্মের নিম্নে প্রোথিত দেখা যাইবে!

এ একটা প্রকাণ্ড বিয়োগান্ত নাটকের মতই, বহু বিচিত্রতার মধ্য দিয়া দিনের পর দিন অভিনীত হইয়া যাইতেছে; নিপুণ তুলিকায় হাসি কান্নার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে! মেঘের পাশে রৌদ্রের মতই এর সুখের ও দুঃখের দিনগুলি পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে! কখন যে সকল রস ভঙ্গ করিয়া দিয়া, বিপুল রূপৈশ্বর্য্যের অন্তরাল হইতে ক্ষুধিত কঙ্কালের মতই, সুখের হাসির মধ্য দিয়া দুঃখের অশ্রু অতর্কিতে বাহির হইয়া আইসে, এবং ধ্বংস লীলায় বিশ্বকে চকিত, সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, তাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝা যায় না।

এমনটা যে কেন হয়, মানুষ বহু বিতর্কের মধ্য দিয়াও তো তাহার মীমাংসা খুঁজিয়া পায় না! এই যে হাসি কান্না, এর কি কোনও মূল্যই নাই? এই যে অতর্কিত, নিষ্ঠুর আঘাত, এই যে মর্ম্মান্তিক হাহাকার, এগুলি কি কিছুই নহে! ইহার আরম্ভ ও শেষ কি শুধু এখানেই?

মাথার উপরকার উন্মুক্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি দেখা

যাইতেছিল; তাহারা উন্মুখ দৃষ্টিতে যেন আমারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!

সৃষ্টির আদি বেলা হইতেই উহারা যে অমনি করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে,—কেন? মাটীর পৃথিবীটার বাহিরে এই যে বিপুল, বিচিত্র, অনন্ত রহস্যাধার বিশ্ব রহিয়াছে, উহার সঙ্গিত কি মানুষের যোগ নাই? শুধুই কি মানুষকে একটু তৃপ্তি দিবার জন্য, তাহার বিস্ময় পুলকিত দৃষ্টিকে নন্দিত করিবার জন্য, উহারা অনাদিকাল ঐ উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু ঐ নক্ষত্র লোকের ওপারেও যে মানুষের অপরি-তৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অন্ধ আবেগে ছুটিয়াছে;—ওর সঙ্গে একটা নিবিড় পরি-চয় স্থাপন করিবার জন্যও যে মানুষ অন্তরে অন্তরে কতখানি লুব্ধ, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

এর কোনোটাকেই তো অস্বীকার করা চলে না, মিথ্যা বলা যায় না!

কিন্তু এই লুব্ধতার ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির পথ কোথায়?—সে মীমাংসা কি মরণের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়? তবে কি মরণ জীবনেরই আরম্ভ মাত্র? তাই কি এই অতিথিটা জীবন নাট্যের অভিনয়ের যে কোনও অংশে অরসিকের মতই এমন করিয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া জানাইয়া দেয়, "ওরে মুগ্ধ, ওরে ভ্রান্ত, তোর জীবনের পূর্ণতা এই মাটীর পৃথিবীরই বাহিরে! একে তুচ্ছ করিয়া, এর সমস্ত বাধা বন্ধন কাটিয়াই তুই ঐ বিরাটকে লাভ করিতে পারিস্‌, —এবং তোর সকল আকাঙ্ক্ষার সমাধান করিতে পারিস্‌!"—

আজ অজিতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবলি মনে হইতেছিল, একটী পরিপূর্ণ আনন্দস্রোত বহিয়া চলিয়াছিল, কে তাহার উৎস মুখ এমন করিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছে ?

ওরে, সে কতখানি অকরুণ, কতখানি নিষ্ঠুর !

আবার তখনি মনে হইতেছিল, তা' কি হয় ?—যে এমন করিয়া জীবন হরণ করিতে পারে, সে কি নিষ্ঠুর ? করুণা পারাবার না হইলে তো এমন নিষ্ঠুরতা সাজে না !

নদীর কুল ভাঙ্গে, আর এক কুল গড়িয়া উঠিবার জন্যই ! আজ যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কাল সে কোথায়, কতখানি সৌন্দর্য্য লইয়া গড়িয়া উঠিবে,—অন্ধ মানুষ তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে ?—

কিন্তু, ওরে, তবু কি মন বুঝিতে চায় ? যিনি ভাঙ্গা গড়ার মালিক, তিনি এমন করিয়া কান্নার সুরে সুরে বুকের ভিতরটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন কেন ?

—দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল, কিন্তু তখনই তাহাদের মনে পড়িল, যাহারা অন্তহীন দুঃখের সমুদ্র বুকের মধ্যে লইয়া, নীরবে অজিতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে ! রাত্রির অন্ধকার আসিয়া কখন দিনের আলো নিভাইয়া দিতেছে সে খবরও তাহারা আজ সাতদিন রাখে না, আবার কখন প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণ জাগিয়া উঠিয়া চরাচরকে আলোকস্নাত করিয়া দিতেছে, সে সংবাদও তাহাদের নিকট পৌছে না !

এমন শোকের চিত্র আর কখনও দেখিয়াছি মনে হয় না ! শোক তখনি অত্যন্ত ভীষণ, যখন সে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে না,

শুধু দুই চক্ষের অশ্রুাগ্র জ্বালা রহিয়া রহিয়া জানাইয়া দেয়, কোথায় অন্তরে অন্তরে অগ্নিসমুদ্র গুমরিতেছে!'

বৌদিদি নিঃশব্দে কখন আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, জানিতে পারি নাই! স্নেহাশীষের মতই মাথার উপর তাঁহার কোমল হস্তের মৃদুস্পর্শ আমাকে জানাইয়া দিল, যে, এই বাড়ীটার মধ্যে আজ্ যে কয়টী প্রাণী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের উপরই তাঁহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে!

বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কি,—বৌদি?"—

"কিছু নয়, ঠাকুরপো! এই খোলা বারান্দার উপর এমন করে বসে থাক্‌লে আর কি হবে বল? অজিতের কাছে বস্‌বে চল! দেখ যদি কিছু কর্‌তে পার! এ সাত দিন সাত রাত্রি ওর ঘর ছাড়নি', আজ বাইরে এসে বসে রইলে, ওর বাপ্ বোন্ আরও অস্থির হয়ে উঠবে যে!"

শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম, "ডাক্তার কি বলে গেছেন, জান?"

—"জানি;—কি কর্‌বে বল? মানুষের চেষ্টার যদি কোনো মূল্য থাক্‌ত, তাহ'লে অবিশ্যি ফল পেতে;—কিন্তু তা যে কতই তুচ্ছ, এ কয়দিনের প্রাণপণ চেষ্টার পর তা' বুঝ্‌তে তো আর বাকী নেই, বিনু!—এখন ওঠ!"

কিন্তু উঠিবার শক্তি সত্যই আর একবিন্দুও ছিল না! ভিতরে যাইয়া ত আবারও ঐ দারুণ শোকের ছবি দেখিতে হইবে!

দূরে ধূসর ছায়ার আবৃত নন্দন-পাহাড়টা দেখা যাইতেছিল; যেন একটা বিপুলকায় দৈত্য সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এইমাত্র

ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার নিঃশ্বাসের শব্দ বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া আমারই কাণের কাছে তাহার অস্তিত্ব জানাইয়া যাইতেছে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি স্নেহপূর্ণ মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "ঠাকুরপো!"

বৌদিদির এই সুরের আহ্বানটীকে আমি বিশেষ করিয়া চিনিতাম; সুতরাং একটু চকিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম!

—চক্ষু দুটী সত্যই জলে ভরিয়া গিয়াছে; এবং ক্ষুদ্র অধরপুট দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া তিনি যে কান্নার বেগটাকে রোধ করিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা, একবার মুখের দিকে চাহিয়াই, বেশ্ বুঝিতে পারিলাম!

"সর্ব্বনাশ যে কতদিক্ থেকেই ঘিরে এসেচে তা' তুমিও ঠিক্ জান না ঠাকুরপো! কিন্তু আজ্ ঠিক এমন একটা মুহূর্ত্তে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন তোমাকে আর সকল কথা না জানিয়ে পারচিনে!"

আমি বুঝিতেই পারিলাম না, মাথার উপর বিধাতার যে নিষ্ঠুর খড়্গ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বনাশকর এমন আর কোন্ ব্যাপার যুক্ত হইতে পারে যাহার কথা মনে করিয়া বৌদিদির মত অত্যন্ত বুদ্ধিশালিনী নারীও স্বস্তি পাইতেছেন না! তবু ব্যাপারটা যে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার কিছু নহে এবং অত্যন্ত গুরুতর তাহা আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

"যিনি সকল ব্যাপারকে এমন করে জড়িয়ে জটিল করে তুলচেন, তিনি বেশী কথা বল্‌বার অবসর তো রাখেন্‌নি, ঠাকুরপো! তাই আজ এত বড় সর্ব্বনাশের সাম্‌নে দাঁড়িয়েও, যে কথাটাকে তোমার কাছে না বলে পারচিনে, সে কথাটা কত বড়ই যে সাংঘাতিক, তা' তুমি এতেই বুঝে, মনটা একটু ঠিক্ করতে পারবে কিনা, বল!"—

বৌদিদি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই একেবারেই চুপ করিয়া গেলেন। এত দুঃখেও হাসি আসিতেছিল; বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, "যে কথাটা তুমি নিজেই মনের ভিতর রেখে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রস্তুত কর্ত্তে চাচ্ছ, তা' যতটাই শক্ত হোক্ না কেন, আমি ঠিক্ সহ্য কর্ত্তে পারব। তুমি বল, বৌদি,"— কিন্তু মানুষ যত বড়ই প্রতিজ্ঞা করুক্ না কেন,সে প্রতিজ্ঞা করিবার সময়ে কখনই মনে করে না, যে, তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই, তাহার মাথায় অকারণে এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে একটা দারুণ বজ্রাঘাত বা অমনি একটা কিছু হইবে, তাই বৌদিদি যখন তাঁহার দুই হাতের মধ্যে লুণ্ঠিত অঞ্চলের প্রান্তভাগটা তুলিয়া লইয়া, মুঠা করিয়া ধরিয়া,—ধীরে ধীরে কহিলেন, "ঠাকুরপো,— উনি সুজাতার সঙ্গে অনিলের বিয়ে ঠিক্ করে পাকা কথা দিয়ে এসেচেন;—কল্‌কাতার অতুলদের বাসায় গিয়ে মামীমার সঙ্গে এ সব কথাবার্ত্তা হয়েচে!"—তখন আমার মনে হইল ঠিক আমার মাথার উপরকার আকাশটা অনেকখানি ফাঁক্ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে একখানা বিপুল বলশালী,

নিষ্ঠুর, অদৃশ্য হস্ত বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া সবলে একটা নাড়া দিয়া আমার সকল আশা, আনন্দ চিহ্নহীন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেল, এবং ভিতরে ভিতরে শক্তিমান্ বলিয়া যে দর্পটুকু ছিল তাহাও একেবারেই চূর্ণ করিয়া দিল!

নন্দন পাহাড়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিলাম; মনে হইল, সেই নিদ্রিত দানবরাজ ঘুমের মধ্যেই একটু গা নাড়া দিয়া উঠিতেছে, এবং এখনি উঠিয়া আসিয়া বিকট মূর্ত্তিতে এই সিঁড়ির পাশের প্রাঙ্গণের উপরই দাঁড়াইবে!

তবুও দুই হাতে সিঁড়ির প্রান্তভাগটা চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, "এ সব কথা আর কেন বল্‌চ, বৌদি! আজ্ যেটা সব চেয়ে বড় বিপদ্ তার সঙ্গেই যুঝ্‌তে দাও;—তার পর ও সব কথা, কোনও দিন সময় হয়তো, শোনা যাবে!—আর এ সব কথার মীমাংসা কর্‌বার ভারও তো আমাদের উপর কেউ দেয় নি;—ও নিয়ে আর মিছে উদ্বেগ বাড়ালে চল্‌বে কেন,—বৌদি?"

"আজ্ এত বড় বিপদের মধ্যে এ সব কথা যে কারু মনে আস্‌তে পারে না, তা' আমিই কি জানিনে, বিনু?—কিন্তু তবু সত্যি আজ আমি বড় ভয় পেয়ে গেছি; অজিতের শিয়রে যদি ওঁকে পাষাণ মূর্ত্তির মতই অমন স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে না দেখ্‌তাম, তা' হলেও বুঝি আজ আমার উদ্বেগ এতটা সীমা ছাড়িয়ে যেত না! কিন্তু উনি যা করবেন না কর্‌বেন তা' শুধু একবার স্থির করে ফেলেই যে কতখানি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেন, এবং কেউই যে আর তা' ওল্‌টাতে পারে না, সে খবরটা আর কেউ না পাক্, আমি তো

এই কয় মাসের মধ্যে বিশেষ করেই জেনেচি, ঠাকুরপো; তাই নি... মনটাকে আর কোন মতেই তো বোঝাতে পারচিনে। এর মীমাংসা আর আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই স্থির করে উঠতে পা... ...ই তো, তোমাকে, যতই বিশ্রী দেখাক্, এই বিপদে ...কূলে দাঁড়িয়েও, সব বল্‌তে এসেচি! তবু সব কথা খুলে ...বার সময় কি আমাকে ঠাকুর দেবেন!—

"...র মীমাংসা যদি তোমার বুদ্ধিতে না আসে, তবে আর কারু বুদ্ধিতে আস্‌বে মনে করিনে। তবে একটা কথা কিন্তু আমার মনে ...চ্ছ, বৌদি, এর একটা যে কোনও আলোচনা কর্ত্তে গেলেই, সেটা এ...ই বিশ্রী হবে এবং নিজেদের স্বার্থটাকে এমনি বড় করে তোলা হবে, যে, আমি তোমাকে ওসব বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতেই বলি!"

বৌদিদি কহিলেন, "আ আমার কপাল, এই বুদ্ধি নিয়েই বুঝি দুনিয়া...সকল যুদ্ধ জিতে আস্‌বে! ওরে, নিজের স্বার্থটাই ত্যাগ করিতে শিখেচ, কিন্তু অন্যের স্বার্থ রক্ষা করবার বুদ্ধিটাও একটু আধটু না থাক্‌লে চলে কই? এত যে বিপদ, তবু এরি মধ্যে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, সে শুধু ওর মুখ চেয়ে; ও যে নীরবে মুস্‌ড়ে যাচ্ছে; চারিদিক থেকেই আগুনে ঐ একবিন্দু মেয়েটাকে ঘিরেচে; ওকে রক্ষে কর্ত্তে হবে,—বাঁচাতেই হবে! আজ সব চেয়ে সহজ কাজটা করেই তুমি খালাস পাচ্ছ কই? ওই সুজাতাকেও যে আজ তোমার না দেখ্‌লেই নয়, ঠাকুর পো!"—

বৌদিদির কণ্ঠস্বর করুণ ও অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল;

কোনও কথা বলিলাম না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "এ যে কি গ্লানি রাতদিন বুকের ভিতর পুষে রেখেচি তা' বলে বোঝানো যাবে না ত! তার মুখের দিকে সাহস করে যে চাইব, সে শক্তিও আমার নেই ; আর তার বেদনার পরিমাণ করে ওঠবার ক্ষমতাও আমাদের কারু নেই! অজিতের বিছানার কাছে বসে বসে যখন দেখি, সুজাতা মাঝে মাঝে দুই হাতে খাটের বাজু চেপে ধরে, আর তার অশ্রুহীন চোখ দুটো বাইরের আকাশের দিকে মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে থাকে, তখন ইচ্ছা হয় আমি চেঁচিয়ে উঠে তাকে দুই হাতে টেনে বুকের মধ্যে আনি! তার এ জ্বালার উপর প্রলেপ দেবার ক্ষমতাই যদি আমার না ছিল, তা' হলে তাকে এমন করে পুড়ে মরবার সহজ পথটা কেন আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম। ওরে, এতটুকু মেয়ে, তার জন্য পর পর যে সব কঠিন আঘাত তৈরী হয়ে রয়েচে তা' মনে করতেও যে আমার বুকের রক্ত জমে যায়!"—

—"এতকাল তোমার কোলের ছায়ায় গড়ে উঠ্লাম, তুমি যে কি চাচ্ছ তা' কি আর আমি বুঝিনি, বৌদি'! কিন্তু তবু তুমি যে তোমার সুজাতাকে কেমন করে বাঁচাবে তা' আমি ভেবে পাচ্ছি নে!"—

"এর বুদ্ধি তোমাকে একটা কর্ত্তেই হবে, ঠাকুর পো!—সব চেয়ে বড় বিপদের কথা হয়েচে কোথায় জান?—সেদিন ত্রিকূট দেখে ফিরে আস্‌বার পরই সুজাতার সাম্‌নেই আমাকে ডেকে বাবা বল্‌লেন,—

"মা লক্ষী, ওকে তো অনিলের হাতেই দেব বলে কল্‌কাতায় তার মার সঙ্গে পাকা কথা ঠিক করে এলাম;—একালের বাপদের মত মেয়ের কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করা যদি আমি ভাল মনে কর্‌তাম, তা' হলে হয়তো সুজাতাকে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌তাম;—এই পর্য্যন্ত বলেই একটু হেসে মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লেন. 'তা' আমার মা—তার বুড়ো ছেলের কথা চিরদিনই মেনে চলেছে, এবং এবারেও বুড়ার এই শেষ আশীষ্‌ মাথায় রেখে সুখী হোক্‌।"—তার পর কি ভেবে একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন, "প্রথম মনে করেছিলাম, ওকে বিনুর হাতেই দেব, কিন্তু অতুল একদিন বল্‌ছিল, বিদ্যুতের সঙ্গে বিনুর বিয়ের চেষ্টা সে কর্‌চে, এবং চিঠি পত্রও লিখেছে তাই ভেবে দেখ্‌লাম, এ বেশ হবে, এরা দুটীতেই উপযুক্ত পাত্রে পড়্‌বে; আমি তাই কল্‌কাতা যখন গেলাম অতুলের কথামতই তার মার সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে এসেচি!— তোমার কাছাকাছি মাকে রাখ্‌ব এ ইচ্ছাটা আমার বড়ই হয়েছিল; তা' এ বেশ হ'ল, সব দিকেই কারু কিছু আর ক্ষোভ রইল না।"—ওঁর কথা শুনে আমার অবস্থা যা' হল তা' তোমাকে আর বলে বোঝাতে হবে না! একবার সুজাতার মুখের দিকে চাইলাম, সে কাঠের পুতুলের মতই বসে রয়েচে; এত বড় যে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল, সে তা' যেন প্রথমটা বুঝ্‌তেই পারেনি!"

বৌদিদির কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, তারু

পর ধীরে ধীরে কহিলাম,—"তা, সুজাতা তার বাপের কথা বেদবাক্য বলে মনে করে দেখেছি, সে যদি তাঁর কথা শোনে, সব গোলই ত মিটে যায়!—আর সে যে শুন্‌বে না, এমন কোনও লক্ষণও তো তার তুমি পাওনি,—বৌদি!" কথাটা বলিবার সময়ে আমার কণ্ঠ নালীটা কেহ যেন কঠিন হস্তে টিপিয়া ধরিতেছিল!

—"বিপদ যে ঠিক ঐ খানটাতেই সঙ্গীন্ হয়ে উঠেচে! সুজাতা তার বাপের কথার বিরুদ্ধে একটা নিঃশ্বাসও ফেল্‌বে না ত; সে তেমন মেয়েই নয়, ঠাকুর পো?"—

"তবে আর কি, বৌদিদি!"—কথাটা বলিয়াই ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া ঐ নন্দন পাহাড়ের কঠিন, শীতল বক্ষের উপর মুখ রক্ষা করিয়া একবার চীৎকার করিয়া বুকের ভিতরকার দারুণ জ্বালাটাকে বাহির করিয়া দিই!

কিন্তু কি অদ্ভুত শক্তি দিয়া ভগবান্ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন! এই মানুষই, যাহার গায়ে তুচ্ছ কাঁটার আঁচড়টাও সহ্য করিতে পারে না, তাহাকেই নিজের হাতে চিতা ভস্মে পরিণত করিয়া আইসে! ওরে, যে আঘাতে পর্ব্বতও চূর্ণ হয়, তাহাই এই মানুষ বুক পাতিয়া সহ্য করে!

বৌদিদি এবার আঁচল তুলিয়া চখের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "তবে আর কিছুই না ঠাকুর পো,—সোজা কথায়, সুজাতা বাঁচ্‌বে না, এবং আমার সব চেয়ে বড় দুঃখই এই যে, আমিই ওকে মার্‌লাম! আজ যখন অজিতের দিকে চেয়ে চেয়ে

বাবা বল্‌লেন,—"অতুল ও অমিলকে ডেকে পাঠাও, মা আজি' যখন আর আমার কোন বন্ধনই রাখ্‌বে না, তখন সত্যিই সব দিক্‌কার হিসেব একটু সময় থাক্‌তে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল; —এর পর আমার মাথাটাই স্থির রাখ্‌তে পারব কিনা তাহাই এক একবার সন্দেহ হচ্ছে! তবু কেবলি মনে হয়, মা লক্ষ্মী, এত বড় পরীক্ষার উপযুক্ত ও তো আমি নই!—প্রভাত যেদিন চলে গেল, সে দিন এই বলেই মনটাকে বুঝিয়েছিলাম, যে ওর মা ত ছেলেদের বড় ভাল বাসত, তাই একটাকে কাছে নিয়ে রাখ্‌ল! অজি'কে বুকে করে রাখ্‌লাম; মা হারা ছেলেকে মায়ের স্নেহ দিয়ে জড়িয়ে রাখ্‌তে হ'ল। ওযে বড় হয়ে উঠ্‌চে, সব দিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে, তা' মনে করেও ত স্বস্তি পাইনি, মা লক্ষ্মী। কত রাত ওর মুখের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েচি আর দুই হাত জোড় করে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই বার বার জানিয়েছি যে, এই বুড়ো বয়সে যখন ওর মুখ দেখ্‌বার মত চোখের দৃষ্টিও কমে যাচ্ছে, তখন এ আঁধারের আলোক রেখাটুকুকে নিভিয়ে দিয়োনা! কিন্তু মা লক্ষ্মী, তিনি কি প্রার্থনা শুন্‌লেন?—না আমাকে রিক্ত কাঙ্গাল করেই তিনি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করবেন! তাই এই আলোটুকু থাক্‌তে থাক্‌তেই এদিককার সব হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফেল্‌তে চাই, মা লক্ষ্মী!'—কথা কয়টি বলেই তিনি একটু হাস্‌লেন; সে হাসি, ঠাকুর পো, যেন আমার চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লোপ করে দিল। তার পর এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই সুজাতা

যে আমার কোলের মধ্যে মাথা রেখে চুপ করে পড়ে ছিল, একটু কাঁদেনি; একটা বড় করে নিশ্বাসও ফেলেনি; শুধু নিঃশব্দে পড়ে র'হল; আমি কি বুঝিনি, বিনুও কতখানি ব্যথা বুকের ভিতর রেখে আমার কোলের মাঝে মুখ লুকিয়েছিল? —তুমি আমার ছেলের মত, ঠাকুরপো, তবু না বলে পারিনে, তোমরা পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের এ কষ্ট বুঝ্‌বার মত ক্ষমতা তোমাদের নেইও, থাক্‌বে এ আশাও আমরা করি নে।—কিন্তু মেয়ে মানুষের বুকের ব্যথা আমি ত বুঝি, আমি কেমন করে চুপ করে থাক্‌ব?—তাই আমার এমন অজির সোণার শরীর কালি হয়ে গেছে তা' যখন চোখে পড়ে তখন হাজার অস্থির হয়ে উঠ্‌লেও নিজেকে সাম্‌লে নিই; কারণ তখনি ত ঐ সুজাতার শুক্‌নো, রুক্ষ মুখ খানার দিকে চোখ্‌ ফিরে আসে! —আহা, ওর দুঃখের যে আর পার নেই, ঠাকুর পো;—ওযে অমন সোণার চাঁদ ভাইকেও হারাতে বসেছে, নিজেকেও বিসর্জ্জন দিতে অগাধ জলে নেমে পড়েছে!"—শেষ দিক্‌কার কথাগুলি বলিয়াই তিনি অঞ্চলের প্রান্ত তুলিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন!

এই আশ্চর্য্য প্রকৃতির নারীকে আমি বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি! অন্যের দুঃখ কষ্ট এমন করিয়া বুকে তুলিয়া লইতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

দেবতার মেঘের মত, স্নেহ বর্ষণই যেন এই অদ্ভুত নারীর সমস্ত জীবনের কার্য্য!

মনে মনে ইহাঁকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "যিনি তোমাকে

এমন্ করে বিশ্বসংসারের ব্যথা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বুকে জড় কর্‌বার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে সেই ব্যথা শান্ত কর্‌বার পন্থা দেখিয়ে দেবেন, বৌদি'!—ঠিক্ এই মুহূর্ত্ত থেকে আমি ওসব কথা চিন্তা করা একেবারেই ছেড়ে দিলাম? আমি জানি যিনি সব ব্যাপারকে জটীল করে তোলেন, তিনিই আবার কেমন করে যে নিমিষের মধ্যে সব সরল করে দেন, তা' চিরদিনই আমাদের বোঝ্‌বার বাইরে থেকে যাবে!—তোমার পায়ের একটু ধুলো আমার মাথায় দিয়ে যাও, বৌদি';—যদি এতটুকু দুর্ব্বলতাও আমি বুকের ভিতর অনুভব করে থাকি, তা'হলে তোমার ঐ পায়ের ধুলাই আমার সে দুর্ব্বলতাকে নষ্ট করে দেবে! —এর পর সুজাতা সম্বন্ধে সব চিন্তাই তোমার উপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম"—কণ্ঠের স্বর এমন করিয়া আর কোনও দিন রুদ্ধ হইয়া আইসে নাই! চোখের জলে কিছু দেখিতে পাইতে-ছিলাম না, তবু দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বৌদিদির পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইলাম।

চিরদিনই ঐ বিপুল স্নেহশালিনী নারীর পায়ের ধুলা লইয়া কৃতার্থ হই; কিন্তু আজ মনে হইল, সেই ক্ষুদ্র রাঙ্গা পা'দুইখানির এতটুকু ধুলার মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত আশীষ আমার জন্য সঞ্চিত ছিল!"

২০

দুনিয়ার ছোট বড় সকল ব্যাপারেরই কর্ত্তা যিনি, তাঁহার বিচার অতর্কিতে কোন্ পথে কখন আসিয়া পৌঁছে, তাহা জানিবার

পূর্ব্বেই তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে বসিয়া, মানুষ যে কতখানি দুঃসাহসের পরিচয় প্রদান করে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়!

এই অতি তুচ্ছ নগণ্য কীটের স্পর্দ্ধিত গর্ব্ব দেবতার দেউলকে স্পর্শ করিয়া বাড়িয়া উঠে, এবং বিশ্বরাজের সিংহাসনকেও অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে!

মানুষ যে এতখানি সাহস করে, গর্ব্বে এমন অন্ধ হইয়া উঠে, সে কি শুধু ভিতরে ভিতরে এই কথাটা জানে বলিয়াই, যে, ঐ করুণামৃতের ভাণ্ডার তাহার কোনও অপরাধই উজাড় করিয়া দিতে পারিবে না।

কত অপরাধই তো মানুষ করে, কিন্তু কই, তিনি তো কৃপণের মত ওজন করিয়া, হিসাব করিয়া তাঁহার করুণামৃত পরিবেশন করেন না!

কিন্তু তবু কি মানুষ বুঝিতে চাহে?

সে তাহার ভ্রান্তি নিয়াই গর্ব্ব করে;—অন্ধদৃষ্টি, পরকলায় ঢাকিয়া নিজেরই রচিত নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরিয়া মরে!

ওরে, এ যে কত বড় অপরাধ, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাই কি তাহার আছে?

কত দিক্ দিয়াই তো কত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু আজ যখনই মনে হইতেছিল, সকল অপরাধকে মার্জ্জনা করিয়া যদি তিনি ঐ ক্ষুদ্র বালকের প্রাণটুকু ফিরাইয়া দেন; তখনই আবার কে যেন অন্তরের মধ্য হইতে সাড়া দিয়া কহিতেছিল—

"ওরে অন্ধ, ওরে তুচ্ছ,—তুই এমনি করিয়াই তো তোর অপরাধের বোঝা বাড়াইয়া তুলিস্! বিশ্বের সকল বেদনার আর্ত্তি তাঁহার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যে তিনি, সকল শুভ, সকল মঙ্গলকে মানুষের দিকে প্রেরণ করিয়াছেন! ওরে, তুই যে খেলা বুঝিবি না, তা' শুধু নীরবে দেখিতেই থাক্। তার পর একদিন মরণের অমৃত ভাণ্ডারের মধ্যে তোর সকল তুচ্ছতাকে ডুবাইয়া, লুটাইয়া দিস্! তোর সকল বেদনার শান্তি সেইখানে; সকল হাহাকারের পরিসমাপ্তিও ঠিক্ সেই জীবন মৃত্যুর সীমান্ত রেখার কাছটীতে!

"ওরে সকল বাধা বন্ধনের শৃঙ্খল ভাঙ্গিলেই তো তোর মুক্তি!—তবেই ত তোর ছুটি!"

ভোরের আলো কখন ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে সংবাদ এই শোকাচ্ছন্ন ঘরটীর মধ্যে তখনও পৌঁছায় নাই!

কিন্তু পিসীমা অজিতের বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া যখন অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"তোমরা হ'লে কি? ডাক্তার কি বলেছে, তাই নাকি একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌বে? আর সত্যি এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন, যে কবিরাজ ডাক্তারের উপরেও বড় একজন কেউ রয়েছেন, যাঁর ইচ্ছায় সবি হ'তে পারে! বাছা এমন হয়ে পড়েছে বলেই যে ও আর সার্‌বে না, তা' কি কেউ বল্‌তে পারে? মানুষের বোঝ্‌বার বাইরে এমন ঢের ব্যাপার রয়েছে, যার ব্যবস্থা শুধু তিনিই করেন, এবং মানুষ তা' কোনও দিনই

বুঝতে পারবে না!” তখন এই কথাটা মনে করিয়াই আমার মন বিপুল বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, যে, এমন করিয়া সকল মানুষের চিন্তার ধারা ঠিক্ একই পথ ধরিয়া চলে কেমন করিয়া?

আমার মনে হইতেছিল, যখন আর কিছুই করিবার নাই ঠিক সেই মুহূর্ত্তটীতে, আমরা সকলেই যেন একটা অপ্রত্যাশিতের জন্য বসিয়া রহিয়াছি! এবং সেই অপ্রত্যাশিত যে কোন পথ ধরিয়া আসিবে তাহাও যেমন আমরা জানি না, ঠিক্ তেমনি এ কথাটাও জানি না, যে, সে কোন্ আকার ধরিয়াইবা এই দুর্দ্দিনে দেখা দিবে!

কিন্তু তবু তো অনির্দ্দিষ্টের যাত্রীর মতই তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে।

যাহাকে জানি না, এবং যাহাকে মোটেই আশা করি নাই, ভিতরে ভিতরে তাহারই আগমনের জন্য কখন যে অন্তর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও বুঝা যায় না ত!

কিন্তু এতটুকু ইঙ্গিত, এতটুকু আভাষ পরিপূর্ণ ভাবেই জানাইয়া দেয়, যে, হাঁ, সে আসিয়াছে!

তাই পিসিমা যখন কহিলেন, “ওরে, এই বয়সে আমি কতই তো দেখ্‌লাম;—আমি ঠিক্ জানি ঠাকুর কোন্ পথে তাঁর অনুগ্রহ পাঠান তা' মানুষ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও জান্‌তে পারে না।”—তখন আমি এতটুকুও বিস্ময় অনুভব করিলাম না!

পিসিমা কহিলেন, “আমাদের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে হরষিত বলে একটী ছেলের ব্যামো হ'ল, বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিয়ে গেল; কখন যায় এম্‌নি অবস্থা; ছেলেরা সব তার সেবা

কচ্ছিল ; ছেলেমানুষ সব, ঘুমের চোখে ওঁষুধ খাওয়াতে ভুল করে খানিকটে তারপিন্ খাইয়ে দিল ; আধঘণ্টার মধ্যে তার পেট পরিষ্কার হয়ে গেল ; নাড়ীর ভাব বদ্‌লে গেল ;—ছেলেটী বেঁচে উঠ্‌ল ! ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়েও তো তিনি তাঁর দয়া মানুষকে জানাতে ছাড়েন না ! যাকে তিনি কোলে তুলে নেবেন, মানুষ হাজার চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারবে না, আর যাকে তিনি রাখবেন, তাকে বিষ খাইয়েও মানুষ মারতে পারবে না !"

তারপর অজিতের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে রমাপ্রসন্ন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার এতখানি বয়সে আমি কতইতো দেখ্‌লাম ; কতই ভুগলাম ; কিন্তু তার ফলে একটা কথা আমি ঠিক্ জেনে রেখেছি, যে,মানুষের মনের মত এমন সত্যি সাক্ষি আর কেউ দিতে পারে না ! এমন করে খাঁটি কথাটীও আর কেউ জানিয়ে দিতে পারে না ! কত রকম করেই মনের এই জানান কে অস্বীকার করে দেখেছি, কিন্তু এ কখনই চুপ করে থাকেনা, এর যা' বলবার বরাবরই বলে যাচ্ছে, মানুষ মেনে চলুক্, আর নাই চলুক্ ! স্নেহে, উদ্বেগে মানুষ অনেক সময়েই তাকে ধর্‌তে না পার্‌লেও সে কিন্তু ঠিকই সাড়া দিয়া যায় ! তোমরা ওর কাছে বসে, ওর রোগ কাতর মলিন মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে যা' শুন্‌তে পাওনি, আমি একটু দূরে থেকে, ওই পূজোর ঘরে বসে, সে খবরটা ঠিক্‌ই ধর্‌তে পেরেছি !—আমি বলে যাচ্ছি, অজি' সেরে উঠবেই ! তুই ওঠ বিনু ;—বৌমা, তুমিও ওঠো ; অমন করে হাত পা' ভেঙ্গে বসে থাক্‌লে চল্‌বেনা ! দরজা জানালাগুলি খুলে দাও,

বাইরের আলো বাতাস ঘরের ভিতর আসুক্! ঠাকুরের দয়া কোন্ পথ ধরে আস্‌বে তা'তো আমরা কেউই জানিনে।"

রমাপ্রসন্ন বাবু অজিতের শয্যা পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটী কথাও বলেন নাই। মাঝে মাঝে অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন এবং পরক্ষণেই দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন।

এই ধ্যান পরায়ণ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছি; কেবলি মনে হইয়াছে, কতখানি শক্তি ঐ স্নেহব্যাকুল পিতার হৃদয়ে ভগবান্ তুমি দিয়াছ! কেনইবা এই দুরূহ পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া, এমন করিয়া সেই শক্তির পরিচয় তুমি গ্রহণ করিতেছ।

এখন পিসিমার কথা শুনিয়া রমাপ্রসন্ন বাবু কহিলেন, "আপনি ঠিক্ বলেছেন, দিদি, তাঁর দয়া যে কোন্ পথে আস্‌বে তা' আমরা কেউই জানিনে! অজিত আমাকে তো যথেষ্ট সময়ই দিয়েছে; এ কয়দিন ঠাকুরের পায়ের কাছে আমার সকল প্রার্থনাই তো জানিয়ে রেখেচি। দানের উপর যে, দিদি, কোনও দাবীই নাই, আমরা এই কথাটা ভুলে যাই বলেই তো যত অনর্থ বেড়ে ওঠে। আমি ওর বিছানার পাশে বসে বসে এই কথাটাই আজ বেশ করে জেনেচি, যে আমাদের সকল প্রার্থনা, আব্দার, সকল ক্রটী বিচ্যুতি তাঁর কাছে নিবেদন করে দিয়েই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়াটাই ঠিক্। কিন্তু তা' কি পারি? পারিনে বলেই তো যত গোল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরবেই রহিলেন। তারপর ধীরে

ধীরে কহিলেন, "ওর মাথায় একটু পায়ের ধুলো দিয়ে আপনি আপনার পূজোর ঘরেই ফিরে যান, আমাদের মধ্যে অন্ততঃ এমন একজন থাকা দরকার যিনি তাঁর পায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনাই একাগ্র হয়ে জানাতে পারবেন।"

বৌদিদি ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়াছিলেন। ভোরের কোমল, শুভ্র অরুণ লেখা শয্যার প্রান্তে পড়িয়া হাসিতেছিল।

টেবিলটার উপরকার দাগকাটা কাঁচের শিশিগুলির মধ্যে নানারঙের ঔষধ রহিয়াছে। খানিকটা আলোক শিশিগুলির উপর পড়িয়া বিচিত্র রঙের ছায়া টেবিলের সুনীল মখমলের উপর ও দেওয়ালের গায়ে ফেলিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকার যে সব করুণ দৃশ্যের উপর একটা অস্পষ্ট আবরণ দিয়া রাখিয়া প্রকৃত অবস্থাটিকে পরিষ্কার বুঝিতে দেয় না, দিনের আলোক তাহা নিষ্ঠুর সত্যের মতই, অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে।

এই ভোরের আলোকপাতে যখন ঘরের ভিতরকার সমস্ত জিনিষগুলি হাসিয়া উঠিল, ঠিক তখনই অজিতের রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখেরদিকে চাহিয়া সকলেই ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিল!

সুজাতা কখন বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। এখন ফিরিয়া আসিয়া একটা গোলাপ অজিতের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে দিতে, তাহার মুখের উপর পড়িয়া বলিয়া উঠিল—

"ও অজি, ও আমার অজি, ভাইটি, তুমি ভিতরে ভিতরে কত

পথ এগিয়ে গেছ, তা' তো আমি রাতের অস্পষ্ট আলোয় বুঝ্তে পারিনি।"

সুজাতার কথা শুনিয়া ঘরের মধ্যে একটা বিপুল শোকের তরঙ্গ বহিয়া গেল।

বৌ-দিদি সুজাতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া নিজেই কাঁদিয়া অস্থির হইলেন।

রমাপ্রসন্ন বাবু বামহাতে একবার মুহূর্তের জন্য কপালের দুইটা পাশ টিপিয়া ধরিলেন; তার পর বাহিরের নির্ম্মল স্নিগ্ধ আলোক-দীপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে অজিতের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

শেষরাত্রি হইতেই ইজি চেয়ারটার উপর পড়িয়া ছিলাম। একবার হাতলের পাশে মুখ সরাইয়া কোটের হাতায় চোখ মুছিয়া লইলাম; তার পর উঠিয়া আসিয়া বৌদিদির মাথা ধরিয়া নাড়া দিয়া ডাকিলাম, "বৌদি"—

কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারেই অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গেল। দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আসন্ন ক্রন্দন বেগটাকে রোধ করিতে যাইয়া একেবারেই কাঁদিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু নন্দন-পাহাড়, রুদ্রের বৃষভের মতই, যাঁহারা বুকের ভিতর চাপিয়া বসিতেছে, সেই রমাপ্রসন্ন বাবুর অশ্রুহীন চোখের দিকে চাহিয়া ঘরের মধ্যে থাকা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

বাহিরে যাইবার জন্য দুয়ারের দিকে ছুটিয়া আসিতেই বাধা পাইলাম।

দুয়ারের কাছেই আলবার্ট আসিয়া পড়িয়াছে। খানিকটা সূর্য্যালোক তাহার গৌর দেহটার উপর পড়িয়া তাহাকে আলোক-স্নাত দেবদূতের মতই দেখাইতেছিল!

আলবার্ট কহিল, "আমি আসিয়াছি!"

এ যেন আশার বাণী বহন করিয়া এইমাত্র কোন অজানা দেশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে!

হাঁ, তুমি আসিয়াছ, আইস! হে দেবদূত! তুমি আইস! আমরা বুঝি এতক্ষণ তোমারই আশা পথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছি! তুমি যদি আসিয়াছ, তোমার আশার বাণী শুনাও!

আল্‌বার্ট ঘরের মধ্যে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে কহিল, "দিদিমণি, ভোরের গাড়ীতে আমার কাকা এখানে এসে পৌঁছেছেন! ভারতবর্ষ দেখেননি। তাই দেখ্‌তে এসেছেন। লণ্ডনের খুব বড় ডাক্তার তিনি; অজির কথা তাঁকে আমি সব বলেচি! যদি অমত না হয় তাঁকে এনে এখনি ওকে দেখান যায়! অজি' আমার ভাইয়ের মত, ওর এমন অসুখ, তাই জেনে ওকে দেখ্‌তেও স্বীকার হলেন। আমি সাইকেলে ছুটে এসেচি!"—

আল্‌বার্ট তখনও পথশ্রান্তিতে হাঁপাইতেছিল। সুন্দর সুগৌর মুখখানি বর্ণসুষমায় রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে!

বিপদ যখন একেবারেই সাঙ্গন্ হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক্ সেই

মুহূর্ত্তেই আল্‌বার্ট তাহার অভয় ও আশার বাণী লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে !

রমাপ্রসন্ন বাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কোনও কথা না বলিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন !

বৌদিদি কহিলেন, "ওরে মাণিক ভাই আমার একবার তুই সুজাতাকে বাঁচিয়েছিস্ ! এবার তোর খেলার সঙ্গী অজি'কে রক্ষা কর্ !—ওরে, তিনি কি আস্‌বেন,—এত দয়া কর্‌বেন ?"

বৌদিদি উঠিয়া তাহার কাছে আসিবার পূর্ব্বেই আল্‌বার্ট একবার অজিতের ম্লান, পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিল, তারপর ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল, "তোমার অনুমতি পেলেই হ'ল, আর আমি কিছু চাইনে তো দিদিমণি !"

সঙ্গে যাইবার জন্ত দ্রুতপদে বাহির হইলাম। আমার ডাক কাণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আল্‌বার্ট সাইকেল ছুটাইয়া মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হইয়া গেল ! পিসিমা একবার সকলের মুখের দিকে স্মিত মুখে চাহিয়া কহিলেন, "ওরে তোরা অত উতলা হস্‌নে ! যিনি এত কাণ্ড কর্‌চেন, তিনি কোন্ পথে কি কর্‌চেন তা' আমরা কেউই তো জানিনে ! তবে শুধু এই টুকুই জেনে রাখ, তিনি যা কর্‌বেন তার মধ্যে ভুল চুক একটুও নেই ! দরকার মত সবই ঠিক্ ঠিক্ ঘটে যাবে !"—বলিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরেই দেখা গেল ডালিতে কিছু পূজোপকরণ লইয়া ঝির সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বৌদিদি কহিলেন, "উনি বুঝি বাবার মন্দিরে চ'লে গেলেন!"

রমাপ্রসন্ন মৃদুস্বরে কহিলেন, "ওঁর সঙ্গে যেয়ে যদি শঙ্করের পায়ের কাছে সব সুখ দুঃখ নিঃশঙ্কে নিবেদন করে দিতে পারতাম তবেই ঠিক হ'ত"; তারপর নিজের মনে মনেই কহিলেন, "তা' পারি কই!—এত দুর্ব্বল তুমি আমায় করেচ ঠাকুর!"

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরেই এক বিরাট শ্বেতকায় পুরুষ সাইকেল হইতেই সিঁড়ির উপর নামিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি দ্রুতপদে বারান্দার উপর আসিতেই আল্‌বার্ট তাহার সাইকেল হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "ইনি আমার কাকা সার্ এডওয়ার্ড লুকাস্!—কাকা, ইনি—মিঃ বিনয় মুখার্জি!"—

শক্তিশালী বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল; কিন্তু একখানি সুদৃঢ় হস্তের প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে আমার হাতখানা পৌঁছিতেই বুঝিলাম, সেই হাতের অধিকারী বিপুল শক্তিশালী; এবং তাঁহার পরম শুভ্র উত্তপ্ত হাতখানার মধ্যে আমার এমন সুপুষ্ট হাতখানাও একটি শিশুর হাতের মতই ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে!

কিন্তু ঐ হস্তের অধিকারী যে কতখানি অমায়িক ও হৃদয়বান্ তাহা তাঁহার প্রথম কথাতেই বুঝিতে পারিলাম। সার্ এডওয়ার্ড আমাকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই কহিলেন,—

"সুপ্রভাত! এর পরে আলাপ পরিচয়ের আনন্দ অনুভব করা যাবে! চলুন, রোগী দেখিব!"

ঘর হইতে মেয়েরা বাহির হইয়া গেলেন। সার্ এডওয়ার্ড অজিতের শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া পড়িয়া প্রায় দশ মিনিট পর্য্যন্ত নানা প্রকারে পরীক্ষা করিলেন।

তারপর উঠিয়া আসিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া কহিলেন, "আল্‌বার্টের কাছে রোগের অবস্থা সবই শুনে নিয়েছি; সেই জন্যেই এত তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এখন আর একটা মিনিটও নষ্ট করা ঠিক হবে না। তবু একটা কথা জান্‌ব।—এর অসুখ আজ ঠিক আট দিন?"—

উৎকণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "হাঁ।"—

"জ্বর হয়েই অজ্ঞান হয়েচে?"—

"হাঁ।"

"কোন ঔষধেই কাজ দেখাই নি?"

"না!"

—"ক্রমেই রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি ধীরে ধীরে জ্বর কমে যাচ্ছে?"—

যন্ত্র চালিতের মতই কহিলাম, "ঠিক তাই!"—

—"জ্ঞানের একটু লক্ষণও কোন দিন দেখায় নি?"—

"না।"

"বেশ, আর আমি কিছু জানতে চাইনে! আপনারা সবাই এর আপনার জন নিশ্চয়ই?"

"হাঁ।"—

সার্ এডওয়ার্ড আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার

ত্রিশ বৎসরের ডাক্তারীর অভিজ্ঞতার মধ্যে শুধু দুটী এমনি কেস্ পেয়েছি—একটি বাঁচেনি; একটি রক্ষা পেয়েছিল।”—

—“এর সম্বন্ধে কি মনে করেন?”—

“কিছু মনে করিনে; বাঁচা না বাঁচা ভগবানের হাত। চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু একমাত্র উপায় আছে এবং এখন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যবস্থা না করতে পারলে, রক্ষা করার আর কোনও উপায়ই আমি জানিনে।”—

আগ্রহপূর্ণ স্বরে কহিলাম, “সার্ এডওয়ার্ড, এখানে যে কয়টী প্রাণী আমরা আছি এর প্রত্যেকেই এই বালকের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে; কি করতে হবে, বলুন!”—

একটু হাসিয়া সার্ এডওয়ার্ড কহিলেন, “ঠিক প্রাণ দিতে হবে না, তবে কাছাকাছি কিছু দিতে হবে!”—

—“কি?”—

দুয়ারের কাছে অতুল ও অনিলকে দেখা গেল।

সাহেব গম্ভীর মুখে দুয়ারের দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, “এর শরীর এখনি নূতন রক্তে ভরে দিতে হবে,—কে দেবে?”—

একটুকু দ্বিধা না করিয়া, একটু হাসিয়া কহিলাম, “এই কথা—আমি দেব!—আপনি বন্দোবস্ত করুন্।”—

কথাটা যেন কতই ক্ষুদ্র, ও তুচ্ছ মনে হইল, এবং এত অল্প দাবী মিটাইতে পারিলেই যদি মরণের দেবতাটির ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়,—তবে আর কি?

দুয়ারের কাছেই বৌদিদির অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখখানি দেখা যাইতেছিল! তার পাশে আর একখানি অত্যন্ত ম্লান মুখ, বৌদিদির উচ্ছৃঙ্খল, সংসর্পিত চুলের গোছার আড়াল দিয়া, মেঘান্তরিত মলিন, শশাঙ্কের মতই একটু একটু দেখা যাইতেছিল!

অজিতের পীড়ার প্রথম দিন সুজাতার কাতর, করুণ দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে বলিয়াছিলাম, অজিতের জন্য শেষ রক্ত বিন্দুও দিতে প্রস্তুত আছি।

অদৃশ্য দেবতাটি সেদিন বুঝি একটু হাসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার হিসাবের খাতায় সেই কথাটাকে খতাইয়া রাখিয়াছিলেন!

আজ এই মুহূর্ত্তে তাঁহার দাবী জানাইয়া দিলেন এবং হ্যাণ্ড-নোটের দাবীর মতই এটা চাহিবা মাত্র পরিশোধ করিয়া দিতেই হইবে! তাহা না পারিলে নিজের অন্তরের মধ্যে যে দরবার নিশিদিন খোলা রহিয়াছে, আর কাহারও কাছে রেহাই পাইলেও তাহার কাছে তো কোন মতেই রেহাই পাইব না!

সাহেব আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "খুব কঠিন কথা;—বড় শক্ত কথা।"—

একটু আগেই তো বলেচি, আমরা সবাই এর জন্য প্রাণ দিতে পারি, সেটা শুধু মুখের কথাই বলিনি তো, সার্ এডওয়ার্ড!—বলিয়াই একটু হাসিলাম।

"বেশ আপনার গায়ের জামাটা খুলে ফেলুন তো।"—

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অতুল ও অনিল এতক্ষণ কথা শুনিতেছিল। এইক্ষণ অগ্রসর হইয়া সাহেবকে নমস্কার করিয়া কহিল,

"আমরাও যে কোনও সাহায্য কর্ত্তে পারি আমাদেরও পরীক্ষা করে দেখুন না, সার্ এডওয়ার্ড!"

সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন, "এ বাঙ্গালী জাতটাই একটা অদ্ভুত জাত; এরা স্নেহের টানে সবই কর্ত্তে পারে, লণ্ডনে থাকৃতেও সে পরিচয় যথেষ্ট পেয়েচি!"—

সার্ এডওয়ার্ড আর কোনও কথা না বলিয়া একে একে আমাদের তিন জনকেই পরীক্ষা করিলেন।

রমাপ্রসন্নবাবু কহিলেন, "সাহেব এটি আমার ছেলে; ছেলে মানুষ এদের কষ্ট না দিয়ে আমাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন্!"

ইতিমধ্যে অনিলের মুখে বৌদিদির ও সুজাতার আর্ত্তি আসিয়া পৌঁছিল।

সার্ এডওয়ার্ড স্মিতমুখে কহিলেন, "আপনাদের কারু দিয়ে হবে না; মিষ্টার মুখার্জিকে দিয়েই আমার কাজ চল্‌বে! এদের মধ্যে ইনিই যথেষ্ট সবল।"

সার্ এড্ওয়ার্ডের কথা শুনিয়া মনে হইল, এতদিন ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়া শরীরটাকে যে সবল করিয়াছিলাম, আজি তাহা সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়াছে!

অনিল মলিনমুখে কহিল, "আমাদের দিয়ে কোনও কাজ হবে না, সার্ এড্ওয়ার্ড?"

"হাঁ, হবে বই কি! ভাল ডাক্তার অন্ততঃ দুইজন দরকার। ঘড়ি ধরে পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় নিন্, বাইরে সাইকেল

আছে; ছুটে চলে যান। মনে থাকে যেন এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কাজ আরম্ভ করব!—আমার ব্যাগ্‌টা?"

আল্‌বার্ট সিঁড়ির উপর হইতে একটা সুদৃশ্য ব্যাগ্‌ লইয়া আসিল। কতকগুলি আবশ্যকীয় জিনিষের নাম লিখিয়া এক খণ্ড কাগজ অনিলের হাতে দিলেন। অতুল ও অনিল সাইকেল লইয়া বাহির হইয়া গেল। সার্‌ এডওয়ার্ড আর একবার জানালার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিয়া কহিলেন, "মনে থাকে যেন মাত্র বত্রিশ মিনিট সময় পাবেন।"

রমাপ্রসন্ন বাবু একখানা চেয়ারের উপর অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন, বোধ হয় আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।

সার এডওয়ার্ড কহিলেন, "আপনি ওদিক্‌কার একটা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি না ডাক্‌লে আস্‌বেন না।"

সাহেব ক্ষীপ্র, নিপুণ হস্তে কতকগুলি কাজ সারিতেছিলেন, আল্‌বার্ট দ্রুত হস্তে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল।

বৌদিদির পাশ দিয়া যাইবার সময় রমাপ্রসন্ন বাবু একটু দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা লক্ষ্মী,——"

তারপর তাহার দুই কপোল বাহিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নামিয়া আসিতে লাগিল।

আজ আটদিনের মধ্যে তাহার চোখে অশ্রুর এতটুকু আভাস-ও কেহ দেখে নাই। কিন্তু আজ কেন যে তিনি কোনো মতেই

অশ্রুরোধ করিতে পারিলেন না, তাহা আমাদের কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

তাহার অশ্রুমুখী 'মা লক্ষ্মী' যখন দুইহাতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া কহিলেন, "আপনি কিছু ভাব্‌বেন না, বাবা! যিনি এমন সময় সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়ে তুলচেন, তিনিই সকলের মুখ রক্ষা করবেন।"—তখন তিনি বৌদিদির মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, "না, কি আর ভাব্‌ব মা! আর ভেবেই বা কি করতে পারি, মা লক্ষ্মী?"—এর পর তিনি এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিলেন না। আমার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই ডাক্তার সেন ও বোসকে লইয়া অতুল ও অনিল ফিরিয়া আসিল। তখন সার এড্‌ওয়ার্ড সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া কোট ও ওভারকোটটা আল্‌নায় ঝুলাইয়াছেন, এবং অজিতের শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন।

এক মুহূর্ত্তে, সেই বিরাট শ্বেতকায় পুরুষকে আর আমার সার এড্‌ওয়ার্ড বলিয়া মনে হইল না! মনে হইল, দেবাদিদেব মৃত্যুঞ্জয় মরণাহত অজিতের শিয়রে সকল পীড়া ও বেদনা হরণ করিয়া লইবার জন্যই স্বশরীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন!

তখন বৌদিদি ইশারায় আমাকে কাছে ডাকিলেন। তাঁহার মুখখানি একটু ম্লান; চোখের কোণে অশ্রু লাগিয়া রহিয়াছে! দেখিলেই মনে হয়, বুকের ভিতর কোথায় দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া

রহিয়াছে ; এবং ঐ সিক্ত চক্ষুপল্লবের নিম্নেই অশ্রুর প্লাবন লুকা-ইয়া রহিয়াছে।

বৌদিদি আমার মুখের দিকে তাঁহার অশ্রুসজল দুই চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "মনের ভিতর থেকে আমি ঠিকই জান্‌চি, ঠাকুরপো, এ সব ভালর জন্যেই হচ্ছে, কিন্তু তবু স্বস্তি কি পাচ্ছি? ওরে, এম্‌নিই দুর্ব্বল মন, ভগবানের অনুগ্রহের এত পরিচয় পেয়েও মনকে বাঁধ্‌তে পারা যে এত কঠিন তা' তো আজকার মত এমন করে আর কোনো দিনই বুঝতে পারিনি, বিনু! মনের মধ্যে যা' কিছু উঠ্‌চে, সে সবই তাঁর পায়ে পৌঁছে দেওয়ার মত আবশ্যকতা আজকের চেয়ে এমন বেশীও তো আর কোনো দিনই হয়নি! কিন্তু তবু কি মন বোঝে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

কোনও কথা বলিয়াই শেষ করা আজ যে বৌদিদির পক্ষে কতখানি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছিলাম।

আঁচলে একবার চোখ দুইটি মুছিয়া লইয়া মুহূর্ত্ত পরেই কহি-লেন, "তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব, ভাই!—মা মঙ্গলচণ্ডী তোমাকে রক্ষা কর্‌বেন।"

কিছু বলিতে যাইতেছিলাম ; কিন্তু সার্ এড্‌ওয়ার্ডের শান্ত-গভীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "আমরা প্রস্তুত, মিঃ মুখার্জ্জি!"

দুই হাতে বৌদিদির পায়ের ধূলা লইলাম, দুয়ারের পাশেই সুজাতা ছিল, চকিত দৃষ্টিতে তাহার ম্লান মুখের দিকে চাহিলাম।

সুজাতার অশ্রুসজল দুই চক্ষের করুণ দৃষ্টিটুকু আমার উত্তপ্ত

অতৃপ্ত, চক্ষু দুইটার মধ্যে ভরিয়া লইয়া পর মুহূর্ত্তেই অজিতের শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া কহিলাম,—"আমি প্রস্তুত, স্যার এড্-ওয়ার্ড!"

২১

ঠিক কখন যে সব মধুময় হইয়া গেল তাহা জানি না!

কিন্তু বড় মধুর লাগিতেছিল!

কোথায়, কোন্ লোকে, সবুজ আলোক দীপ্তির মধ্যে একা আমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছি! অদূরে সবুজ ক্ষেত্রের উপর, সবুজ আলোকের মধ্যে রাশি রাশি—ফুল ফুটিয়াছে। সবুজ মখমলের উপর কেহ যেন সযত্নে চুণিপান্না বসাইয়া রাখিয়াছে! পাতার আগায় শিশিরবিন্দু সবুজ আলোকে রঙ্গিণ হইয়া রহিয়াছে!

ফুলের পাশে বিচিত্র প্রজাপতি ফুলের মুখের মদিরা চুম্বন করিয়া নৃত্যচঞ্চল গতিতে ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে! সবুজ ক্ষেত্রের পাশে পাশে নির্ম্মল, শুভ্র পথের রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে!

আকাশ নক্ষত্র বিহীন! শুধু সবুজ আলোক তরঙ্গের খেলা চলিয়াছে! আলোক তরঙ্গের শীর্ষে শীর্ষে, স্বর্ণকিরীটের মতই, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সোণালী রঙ্গের জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে,—বিচ্ছু-রিত হইতেছে!

দূরে, অতি দূরে, অনন্ত সুন্দর সিন্ধু তাহার মৃদুস্নিগ্ধ আনন্দ কল্লোলে, রুদ্ধদ্বার দেবমন্দিরে আরতির বাজনার গভীর নির্ঘোষের মতই, আকাশ, বাতাশ পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছে!

নিঃসঙ্গ পথটীর উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ঐ দূর সিন্ধুর যাত্রীশূন্য বেলাভূমি যেন আমার জন্যই উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে!

সিন্ধুর উর্ম্মিকল্লোল শুনিয়া ওর সীমা-রেখারই কাছে কোন্ এক পর্ব্বতশিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

বাঁশীর সুর তাহারই কাছে কাছে, বেলাভূমির পথটির উপর দিয়া বাজিয়া বাজিয়া ফিরিতেছে!

এ সেই চিরপরিচিত ভিখারীর বাঁশীর সুর! বিশ্বের গোপন বেদনার কাহিনীটি এখানেও বহন করিয়া আনিয়াছে কি?

কিন্তু ঐ নিঃসঙ্গ দীর্ঘ পথটী অতিবাহন করিয়া ঐ পাহাড়ের পাদদেশে, ঐ অনন্ত সুন্দর সিন্ধুর বেলাভূমিতে কেমন করিয়া যাইয়া দাঁড়াইব!

কে আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে?

বাঁশী তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, উজাড় করিয়া স্বর ছাড়াইতেছিল, এবং কখনও সেই বেলাভূমির উপর দিয়া, সেই সবুজ ক্ষেত্রের কোমল আলোকদীপ্ত পথটী অতিবাহন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে!

চাহিয়া দেখিলাম, ভিক্ষুকের মলিন চীর খসিয়া পড়িয়াছে,—সুন্দরের মনোমোহন বেশের অন্তরাল দিয়া চির কিশোর দেবতাটীর অপূর্ব্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সুন্দরের বাঁশী বাজিতেছিল,—

"ওগো তুমি আইস!—তুমি আইস! ও যে নন্দন পাহাড়, বাঁশীর সুরের পথটী ধরিয়া এই চিরসুন্দরের দেশে ফুটিয়া উঠিয়াছে,

এবং তোমারই অপেক্ষায় ঐ অনন্ত-সুন্দর সিন্ধুর তীরে জাগিয়া রহিয়াছে!—তুমি আইস,—ওগো, তুমি আইস!"

কোমল পথের উপর দিয়া বাঁশীর সুরের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছি,—দ্রুত! আরও দ্রুত!—ঐ নন্দন পাহাড়!

মধুর! বড় মধুর! বাঁশীর সুরে সুরে মধু ক্ষরিত হইতেছিল! আকাশ, বাতাস, আলোক, বাঁশীর সুরের মদির নেশায় পাগল হইয়া উঠিয়াছে!

কাহার মৃদু সুরভি নিশ্বাস ক্লান্ত ললাটের উপর আসিয়া লাগিতেছে? কাহার স্নিগ্ধস্পর্শ মাথার উপর স্নেহের পরিচয় রাখিয়া যাইতেছে? কাহার স্নেহস্রাবী দৃষ্টি মুখের উপর অনিমিখ হইয়া রহিয়াছে!

কে ও?—ও কে গো?

আর একখানি মুখ, দূরে দূরে আড়ালে আড়ালে দেখা যাইতেছিল! বড় সুন্দর মুখখানি! ক্ষুদ্র অধরপল্লবের বান্ধুলি পুষ্পরাগ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে! দুইটী কালো চোখ অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে; তবু সেই চোখের স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু আমারই মুখের দিকে নিমেষ শূন্য হইয়া রহিয়াছে! যেন কতদিনের নিবিড় পরিচয়,—কত জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্ন কাহিনী. করুণ বেদনা, ওই দৃষ্টি বহন করিয়া আনিয়াছে!

ও কাহার মুখ,—কাহার মুখ!

চক্ষু খুলিয়া চাহিলাম!

বৌদিদি শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি

চালনা করিতেছিলেন। মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার দুই চক্ষের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

অদূরে একটা চেয়ারের উপর অনিল শুইয়া ছিল।

বৌদিদি ধীরে ধীরে কহিলেন, "অজি' বেশ ভাল আছে, ঠাকুরপো :—কোন ভয় নেই আর!"

অবসাদে আমার চক্ষু দুইটার পাতা মুদ্রিত হইয়া আসিল; দুয়ারের কাছে ভিখারীর বাঁশী কোমল সুরে বাজিতেছিল।

সেই সুরের মধ্যে আমার সুন্দরের বাঁশীর সুরের রেশটি লাগিয়া রহিয়াছে!

আর একবার চক্ষু খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। ভোরের মৃদু আলোক সমস্ত আকাশটাকে সুনীল ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া প্রভাতের অরুণালোকদীপ্ত "নন্দন-পাহাড়" দেখা যাইতেছিল, হরিৎ প্রান্তরের উপর দিয়া সংসর্পিত পথটী কোন্ অজানা পল্লীর দিকে চলিয়াছে। দূরের প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ীগুলির উপর সূর্য্যালোক পড়িয়া হাসিতেছিল। পল্লবে পল্লবে, পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, স্নিগ্ধ অরুণ লেখা শিশুর নির্ম্মল শুভ্র হাসিটুকুর মতই লাগিয়া রহিয়াছে!

এই নির্ম্মল আলোকের মেলার মধ্যে, জাগিয়া উঠিয়াই যে কথাটি প্রথমেই জানিলাম, তাহা আমার কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের মতই মনে হইতে লাগিল! কিন্তু এতই দুর্ব্বল, যে ঐ পরম আনন্দের সংবাদটিকে অভিনন্দন করিয়া দুটা কথা বলিব, এমন শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না! একটী ক্ষুদ্র অসহায় শিশুর মতই দুর্ব্বল

হইয়া গিয়াছি; এবং বিপুল অবসাদ সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

চোখের প্রান্ত দিয়া অশ্রুর বিন্দু গড়াইয়া আসিতেছিল। বৌদিদি সযত্নে অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন,—

"আজ ভগবানের আশীর্ব্বাদ তো সব দিক্ দিয়েই পেয়েছি, ঠাকুরপো! আজ তোমার সকল অশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হোক্ এবং জীবনের সকল যুদ্ধে এমনি করেই জয়ী হও!"

হাত বাড়াইয়া পায়ের ধুলা লইব, এমন শক্তি ছিল না, তাই চুপ্ করিয়াই পড়িয়া রহিলাম।

ঝি আসিয়া ডাকিল, বৌদিদি উঠিয়া গেলেন।

হঠাৎ অনিল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া আমার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইল। অনিলের মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতেই সে একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "নারীর কালো চোখ যে সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর, তা আমি আর অস্বীকার করিনে বিনয় বাবু! আজ আপনাকে শুধু একটা কথা জানিয়ে দিয়েই আমার যা' বল্‌বার আছে তা' শেষ করে ফেল্‌ব!"

অনিল যে কি বলিবে তা' আমি বুঝিতে না পারিলেও, একটু বুঝিয়াছিলাম, যে, ঠিক্ এই বিশেষ মুহূর্ত্তটাতে বৌদিদির ঐ নূতন ধরণের আশীর্ব্বাণীর মধ্যে অনেকখানি গভীর অর্থ লুক্কায়িত ছিল! তাই বিস্মিত দৃষ্টিতে অনিলের মুখের দিকে চাহিতেই সে তেমনি হাসিমুখে কহিল, "মাপ কর্‌বেন বিনয়বাবু! কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ রেখে কথা বলাটা আমার মোটেই আসেনা।

ওটা আমার কোষ্ঠীতে লেখেই নি! জীবনে রোমান্স্ জিনিষটাকে একেবারে বাদ্ দেওয়া চলে কিনা তার কৈফিয়ৎ নিজের মনের কাছেও যখন আজ আর দেব না বলে ঠিক করেচি, তখন ও নিয়ে বিচার বিতর্ক একেবারেই কর্‌ব না। কিন্তু এটা ঠিক, আমাদের উভয়কেই সুজাতার দিক্ দিয়েই বিচার কর্‌তে হবে!"

হঠাৎ অনিলের কণ্ঠের স্বর অত্যন্ত মৃদু হইয়া গেল এবং সে ধীরে ধীরে কহিল, "কথাটা বল্‌তে হল বলে কিছু মনে কর্‌বেন না, বিনয়বাবু।—কিন্তু আজ যখন আমি ছাড়া এ খবরটাকে আর কেউ আপনার কাছে পৌঁছে দেবে না, তখন সব বলে ফেলাই ভাল! আমি নিঃসন্দেহেই জেনেচি সুজাতা আপনাকে পেলেই ঠিক সুখী হবে"—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অনিল একবার মুহূর্ত্তের জন্যই স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পর একটু হাসিয়া কহিল, "তখন এর মধ্যে আর কোনও তর্ক বা দ্বিধা থাক্‌তেই পারে না দাবীর কথা ত থাক্‌তেই পারে না;—কারণ এ কথার বিচার তো আমাদের নিজেদের দিয়ে করাটা মোটেই চল্‌বে না, বিনয় বাবু!—সুতরাং এর মীমাংসা আজ এখানেই মিটে গেল! রমাপ্রসন্ন বাবুকেও আমি সব কথা জানিয়ে মুক্তি দিয়েচি,"—

তার পর আর একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি এক নিশ্বাসে তো আমার সব কথাই জানিয়ে দিলাম,—এখন আমার ছুটি; এই চব্বিশটা ঘণ্টা যে আমি কতখানি উদ্বেগের মধ্যেই কাটিয়েচি,—তা' শুধু আমার সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন!—শুধু

আপনার চোখ্ খোলার প্রতীক্ষায় এই চেয়ারটার উপরই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি, বিনয় বাবু।" বলিয়াই অনিল হাসিতে লাগিল।

আমি একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

হাসির শাণিত ছুরিতে চিরিয়া চিরিয়া ও যে ওর বুকের ভিতরটা কতখানি ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা মনে করিয়া সত্যই আমি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম!

তবু সেই বেদনার পরিমাণ আমি কতটুকুই অনুমান করিতে পারিয়াছি। আমি কি এমনি করিয়া হাসিমুখে স্বহস্তে নিজেরই হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়িয়া আর একজনের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিতে পারিতাম!

ও যে আজ হাসিমুখে কতখানি দিয়া গেল, তাহা মনে করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

চোখের পাতা দুইটা অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ অনিল যে সেখানে আছে তাহা ভুলিয়া গেলাম। বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও আমার চোখের সম্মুখে লুপ্ত হইয়া গেল।

দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া নিজের মনেই বলিয়া উঠিলাম, "না আমি তো পার্‌তাম না এম্‌নি ক'রে নিজের হাতে সব ভেঙ্গে ধুলায় মিশিয়ে দিতে!"

অনিল চলিয়া যাইতেছিল, দুয়ারের কাছেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে কহিল, "পার্‌তেন বই কি, বিনয় বাবু! আপনি যখন সুজাতাকে ভালবাসেন, তখন নিশ্চয়ই পার্‌তেন।"

পরমুহূর্তেই সিঁড়িগুলি পার হইয়া প্রাঙ্গণের পথটি অতিবাহন করিয়া, অনিল চলিয়া গেল।

বৌদিদি দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ইঃ, একেবারেই ঘেমে গেছ যে।" বলিয়া একটা পাখা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

আমি কোনও কথা না বলিয়া অবসন্নভাবে চক্ষু বুজিয়াই পড়িয়া রহিলাম।

দুঃখের ও সুখের বেদনায় চঞ্চল একটা বিপুল তরঙ্গ বুকের ভিতর আন্দোলিত হইতেছিল।

—মনে হইল, এ যেন সেই অনন্ত সুন্দর সিন্ধু আমারই বেদনা চঞ্চল বুকের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

ভিখারীর বাঁশীটি তখনও সুর তুলিয়া বাজিয়া বাজিয়া পথে পথে ফিরিতেছিল।

বৌদিদি আর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন! সেই স্নেহ কোমলা নারীর মৃদুস্নিগ্ধ স্পর্শ আমার শিরায় শিরায় অমৃত সঞ্চারিত করিতেছিল।

২২

বিকালের দিকে আল্‌বার্ট ও সার এডওয়ার্ড আসিয়াছেন।

বাহিরের বারান্দার উপর বসিয়া সার্ এডওয়ার্ড রমাপ্রসন্ন বাবুর সহিত কথা বলিতেছিলেন। আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ঈজিচেয়ারের উপর আমাকে শায়িত করিয়া অজিতের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

সুজাতা অজিতের পার্শ্বেই বসিয়াছিল। উঠিয়া বৌদিদির কাছে যাইয়া দাঁড়াইল; মুখ ফিরাইতেই সুজাতার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িল।

সুজাতার ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়াছে। বৌদিদি তাহাকে ঠেকিয়া দিয়া কহিলেন, "ওলো, যা' না জানিয়ে আয়, যে তোর কান্না থেমে গেছে। কতই তো কাঁদ্‌লি; কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ তো তা জান্‌ল না রে!"

সুজাতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি জানলেই হল, দিদি। আর কাউকে জান্‌তে হবে না। তুমি যেমনটী ক'রে চোখের জল মোছাতে পার, আর কি কেউ তা' পারে!"

বলিয়াই সুজাতা লজ্জিত মুখে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে যে আর বেশী দূরও না যাইয়া ঠিক কবাটের আড়ালটিতেই রহিয়া গেল, সে খবরটা বৌদিদির কিম্বা আমার অগোচর রহিল না।

কিন্তু ক্ষমা জিনিসটা বৌদিদির কাছে মধ্যে মধ্যে একান্তই দুর্লভ হইয়া উঠিত। একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওরে, জানে কি না দেখিস্। তোর চোখ্ পানে দেখ্‌লেই যে কুরুক্ষেত্র বাধাবে, তার কাছটিও তখন ছাড়্‌বিনে। কিন্তু তুই যে কাঁদুনি, ঠিক্ পাবেন বিনু মুখুয্যে, যখন ওঁর বিশ্বের জাহাজ তলিয়ে যাবে ঐ তোর চোখের জলের নীচে।"—

আল্‌বার্ট অজিতের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল এবং মৃদু মৃদু হাসিতেছিল!

এমন সময়ে পিসিমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার ভাঁড় হইতে বৈদ্যনাথের চরণামৃত সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিলেন।

আল্‌বার্ট কহিল, "কই পিসিমা, আমার মাথায় দিলেন না?"—

পিসিমা হাসিয়া কহিলেন, "ওমা দেব না! তোমার ভিতর দিয়েই তো, বাছা, আমার দেবতাকে এম্‌নি সত্যি করে দেখতে পেলাম! তিনি যে মরণকেও জয় কর্‌বার জন্যই তোমাকে কোন্ দেশ থেকে এনে এখানে আমাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন! তোমার ভিতর দিয়েই তো তাঁর অভয়মূর্ত্তিও দেখলাম, মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির পরিচয়ও পেলাম।"—বলিয়াই পিসিমা আল্‌বার্টকে একেবারে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

আজ কোনো শুচিতার [illegible] দিয়া আর তাঁহাকে দূরে রাখা যাইত না।

মানুষের জীবনে এমন সব ব্যাপার ভগবানের ইচ্ছায় আসিয়া পড়ে যাহা তাহার ভেদ-বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া সকলকেই আপনার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া লইতে শিখাইয়া দেয়!

তারপর একটু হাসিয়া, সকলের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "ওরে, আমি—বলিনি', ঠাকুর কোন্ পথ দিয়ে তাঁর দয়ার পরিচয় দেন, তা' আমরা কিছুই জানিনে! তিনি প্রাণের আগ্রহকে কোনও দিনই ঠেলে ফেলেন না, এটাও যেমন সত্যি, সকল ব্যাপারের মধ্যেই যে তিনি মঙ্গলকেও লুকিয়ে রাখেন, তা'ও তেম্‌নি ঠিক! তাঁর সকল ব্যবস্থাই মাথা পেতে নিতে হবে; তবেই তো জীবনের সব ব্যাপার কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাবে।"

অজিত কখন চক্ষু খুলিয়া, এই-ই প্রথম,—বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতেছিল। সকলের আগেই বৌদিদি তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি শয্যার কাছে গেলেন এবং অজিতের মুখের কাছে মুখ নিয়া স্নেহপূর্ণ মৃদু কণ্ঠে ডাকিলেন,——

—"অজি,"—

অজিত চক্ষুর পাতা নাড়িয়া উত্তর দিল।

দুয়ারের কাছে কখন রমাপ্রসন্ন বাবু আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাহার দুই চক্ষুর পাতা চোখের জলে ভিজিয়া উঠিয়াছে! তাঁহার অশ্রু-ম্লানদৃষ্টি সন্ধ্যার রঙ্গিন্ আকাশের দিকেই নিবদ্ধ ছিল!

যে নিষ্ঠুর বিপদ্ পাষাণ স্তূপের মতই এতদিন সকলেরই বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, কখন তাহা নামিয়া গিয়া "নন্দন-পাহাড়ে" পরিণত হইয়াছে, এবং আমাদের প্রত্যেককেই যখন তাহার শীতল পুষ্প-গন্ধবাহী-বায়ু-প্রবাহে নন্দিত করিল, ঠিক তখনই সেই নিচু, প্রিয়দর্শন যুবককে আমার মনে পড়িল, যে সুজাতার দিকে চাহিয়াই হাসির অন্তরালে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

সম্পূর্ণ।